

সপ্তম অধ্যায়

নাটক

নাটক হল আধুনিক ও গতিশীল শিল্পপ্রকরণ। কারণ নাটকে থাকে জীবনের অনুলিপি, দর্পণের মতো তথ্য এবং সত্যের উপস্থাপনা। সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ নাট্যসাহিত্যকে কাব্যসাহিত্যের মধ্যে স্থান দিয়েছেন। তাঁদের মতে কাব্য দু'প্রকার—দৃশ্য কাব্য ও শ্রব্য কাব্য। নাটক দৃশ্য কাব্য ও শ্রব্য কাব্যের সমন্বয়ে রঙ্গমঞ্চের সাহায্যে গতিমান মানবজীবনের প্রতিচ্ছবি আমাদের সামনে তুলে ধরে।

‘সাহিত্যদর্পণঃ’ গ্রন্থে নাটকের যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, তা নিম্নরূপ—

“নাটকং খ্যাতবৃত্তং স্যাৎ পঞ্চসন্ধি সমন্বিতম্।

বিলাসদ্ব্যাদিগুণবদ্ যুক্তং নানাবিভূতিভিঃ।।

সুখদুঃখসমুদ্ভূতি—নানারস নিরন্তরম্।

পঞ্চাদিকা দশপরাস্তত্রাংকাঃ পরিকীর্তিতাঃ।।

প্রখ্যাতবংশো রাজর্ষিধীরোদাত্তঃ প্রতাপবান্।

দিব্যোহথ দিব্যাদিব্যো বা গুণবান্নায়কো মতঃ।।

এক এব ভবেদঙ্গী শৃঙ্গারো বীর এব বা।

অঙ্গ মন্যে রসাঃ সর্বে কার্যো নির্বহণেহদ্রুতঃ।।

চত্বারঃ পঞ্চ বা সুখ্যাঃ কার্যব্যাপ্ত পুরুষাঃ।

গোপুচ্ছাগ্রাসমাগ্রঃ তু বন্ধনং তস্য কীর্তিতম্।।

সুতরাং সাহিত্যদর্পণকারের মতে নাটকের মধ্যে যে লক্ষণগুলি থাকতে হবে সেগুলি হল— (i) নাট্যবৃত্তান্ত বা কাহিনি হবে সুবিখ্যাত এবং পঞ্চসন্ধিযুক্ত। (ii) এতে বিলাস, ঋষি, প্রভৃতি গুণ থাকবে। (iii) চরিত্রের সুখ-দুঃখের কথা ব্যক্ত হবে। (iv) নানা রস থাকবে। শৃঙ্গার বা বীর রসের মধ্যে একটি অঙ্গীরস হবে, অন্য রসগুলিও প্রকাশিত হবে। তবে নির্বহন সন্ধিতে থাকবে অদ্রুত রস। (v) অঙ্গ সংখ্যা হবে পাঁচ থেকে দশ। (vi) নাটকে চার-পাঁচটি প্রধান পুরুষ থাকবে। প্রধান ব্যক্তি বা নায়ক হবেন বিখ্যাত বংশজাত ব্যক্তি, রাজর্ষি, ধীরোদাত্ত গুণ সম্পন্ন বীর। (vii) নাটকের গঠন হবে গোপুচ্ছাগ্রভাগের মতো। অর্থাৎ গোপুচ্ছের মতো অসমান হবে অঙ্গগুলি। নাটকের শুরুতে থাকে পূর্বরঙ্গ বা মঙ্গলাচরণ, সভাপূজা, তারপর কবির ও নাটকের নাম কথন এবং পরে প্রস্তাবনা করতে হয়। সূত্রধার এই অংশ ঘোষণা করেন বা অভিনয় করেন। আচার্য ভারতের (খ্রিঃপূঃ চতুর্থ—দ্বিতীয় শতক) মতে লোকবৃত্তের অনুকরণই নাটক।

Drama-র প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় বলা হয়েছে—

“Drama is a form of art in which the artist imagines a story concerning persons and incidents without himself describing narrating or explaining what is happening.” নাটক সংলাপহীন হতে পারে—সেক্ষেত্রে তা অবশ্যই হবে ইঙ্গিতধর্মী।

পূর্ণ দৈর্ঘ্যের নাটকে পঞ্চসন্ধি থাকে। একে জার্মান সমালোচক গুস্তাভ ফ্রেইট্যাগ (Gustav Freytag) পিরামিডের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এই পঞ্চসন্ধি হল—(i) সূচনা বা প্রারম্ভ (Exposition), (ii) জটিলতা ও গতিময়তা (Complication and Development), (iii) শীর্ষবিন্দু (Climax), (iv) অবরোহ (Falling Action), (v) উপসংহার (Resolution or Conclusion)।

জাতীয় জীবন ও সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী অন্যতম গতিশীল সাহিত্যের শাখা হল নাটক। নাট্যকার দর্শকের কথা মনে রেখে সমকালীন দেশ ও কালের পটভূমিকে বিষয়বস্তুর মধ্যে রূপ দেন। তবে তা শিল্পী সত্তার মুন্সিয়ানায় চিরকালের হয়ে উঠতে পারে—সমকালীনতার গভী অতিক্রম করে। নাটক দৃশ্যকাব্য হওয়ায় নাট্যকারের উদ্দেশ্যও প্রত্যক্ষভাবে দর্শকচিহ্নে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সঞ্চার করতে পারে। এ প্রসঙ্গে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, “সাধারণের মনকে জাতিপ্রেমের উগ্র উচ্ছ্বাসে উদ্বুদ্ধ করিবার পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম হইতেছে নাটক ও অভিনয়; বহু দেশের বন্ধন মুক্তির ইতিহাসেই এই ঘটনাটি চোখে পড়ে।” [রবীন্দ্র জীবনী (দ্বিতীয় খণ্ড)—বিশ্বভারতী, ১৯৬১, পৃঃ—১৯০]

নাট্যকারের জীবনাভিজ্ঞতা ও সামাজিক সহানুভূতি সমাজ মানসের তাৎপর্যকে নতুনভাবে রূপ দিতে পারে নাটকের মধ্যে। সমকালীন সামাজিক সমস্যা—যে সমস্যায় পীড়িত হচ্ছে নাট্যকার ও দর্শক, ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছে সামাজিক মূল্যবোধের পীড়নে, অস্তিত্বের সংকটে তিলে তিলে অবক্ষয়ের পথে মানুষ অবক্ষয়িত হচ্ছে—তার বিশিষ্ট রূপ প্রকাশিত হয় নাটকের আঙ্গিকে। যুগজীবনের দ্বন্দ্ব, রুচি-বিকৃতি, ভাব-ভাবনা, শীল-সদাচার, আচার-ব্যবহার, শিক্ষা-দীক্ষা প্রভৃতি আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলি নাট্যকারের লেখনীতে জীবন্ত হয়ে ওঠে।

■ নাট্য রচনার সূত্রপাত ও রঙ্গমঞ্চ :

সংস্কৃত ও ইংরেজি নাটকের অনুবাদের মধ্য দিয়ে বাংলা নাটক রচনার সূত্রপাত। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই এদেশে রঙ্গালয় ও নাটক পারস্পরিক সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে এগিয়ে চলতে থাকে। কেননা নাট্যশালার সঙ্গে নাটক রচনার সূত্রটি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে হেরাসিম (গেরাসিম) লেবেডেফ নামে রুশদেশীয় এক ভদ্রলোক কলকাতায় প্রথম নাট্যশালা নির্মাণ করেন, যা ‘বেঙ্গলী থিয়েটার’ নামে খ্যাত।

বেঙ্গলী থিয়েটারে লেবেডেফ ‘The Disguise’ নামে একটি ইংরেজি নাটকের বাংলা অনুবাদ অভিনয় করেন ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দের ২৭শে নভেম্বর। এছাড়া মলিয়ার-এর ‘Love is the Best Doctor’-এর অনুবাদ করেন লেবেডেফ। এই থিয়েটারের প্রতিষ্ঠার পর থেকে নাট্যমোদীরা জানতে পারল যাত্রা ছাড়াও অন্য কোন বিনোদন ব্যবস্থা রয়েছে। এর পরে লেবেডেফের অনুসরণে কেউ কেউ ধনী-জমিদাররা তাঁদের বাড়িতে সখের নাট্যালয় তৈরি করলেন এবং নাট্যরচনায় উৎসাহিত করলেন নাট্যকারদের। কেননা, সিংহ ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রতিষ্ঠিত বেলগাছিয়া নাট্যশালার ডাকেই নাট্যকার মধুসূদনের আবির্ভাব ও বাংলা নাটকের জয়যাত্রা সেখান থেকেই শুরু হয়।

লেবেডেফের 'বেঙ্গলী থিয়েটার' প্রতিষ্ঠার পর সখের নাট্যশালার সূত্রপাত ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে এবং তার বিস্তৃতি ১৮৭২ সালে ন্যাশানাল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠার প্রাক-মুহূর্ত পর্যন্ত। কারণ ন্যাশানাল থিয়েটারই প্রথম সাধারণের রঙ্গালয়। ১৮৩১ সালে প্রসন্নকুমার ঠাকুর তাঁর নারকেলডাঙ্গার বাড়িতে হিন্দু থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে প্রথম রজনীতে অভিনীত হয় ভবভূতির 'উত্তররামচরিতে'র ইংরেজি অনুবাদ।

এরপর ১৮৩৫ সালে নবীনচন্দ্র বসু তাঁর শ্যামবাজারের বাড়িতে নাট্যশালা নির্মাণ করেন। প্রথম অভিনয় হয় ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দরের' নাট্যরূপ। তিনি স্টেজ, দৃশ্যপট ও আলোর প্রয়োগের ক্ষেত্রে পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। মঞ্চে তিনি প্রথম অভিনেত্রী গ্রহণ করেন।

১৮৫৩ সালে নগেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'ওরিয়েন্টাল থিয়েটার'। এখানে 'ওথেলো' নাটকের অভিনয় হয়। ১৮৫৪ সালে প্যারীমোহন বসু তাঁর জোড়াসাঁকোর বাড়িতে জোড়াসাঁকো থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করে শেক্সপিয়রের 'জুলিয়াস সীজার'-এর অভিনয় করান।

কলকাতার প্রখ্যাত ধনী আশুতোষ দেব তাঁর বাড়িতে নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা করেন ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে। এখানে নন্দকুমার রায়ের লেখা 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' নাটক (কালিদাসের নাটকের অনুবাদ) অভিনীত হয়। বহুদিন পরে বাঙালির রঙ্গালয়ে বাংলা নাটকের অভিনয়ে বেশ সাড়া পড়ে গিয়েছিল। এছাড়া বাণভট্টের 'কাদম্বরী' অবলম্বনে মণিমোহন সরকারের 'মহাশ্বেতা' নাটকও এই রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়।

রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকের অভিনয় হয় ১৮৫৭ সালে রামজয় বসাকের বাড়ির নাট্যশালায়। ১৮৫৮তে এই নাটকের অভিনয় হয় গদাধর শেঠের বাড়ির নাট্যশালায়। তাছাড়া এই একই বছর চুঁচুড়ার নরোত্তম পালের বাড়ির নাট্যশালায় এই নাটক অভিনীত হয়।

পরবর্তীকালে ১৮৫৬তে কালীপ্রসন্ন সিংহের বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ, ১৮৫৮তে পাইকপাড়ার বেলগাছিয়া নাট্যশালা, ১৮৫৯ সালে রামগোপাল মল্লিকের প্রাসাদে মেট্রোপলিটন থিয়েটার, ১৮৬৫তে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত পাথুরিয়াঘাটা রঙ্গনাট্যালয়, ১৮৬৫তে শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটি, ১৮৬৫তে ঠাকুরবাড়ির জোড়াসাঁকো থিয়েটার, ১৮৬৮তে বহুবাজার বঙ্গনাট্যালয় এবং ১৮৬৮তে বাগবাজার এমেচার থিয়েটার এবং শ্যামবাজার নাট্যসমাজ প্রভৃতি সখের রঙ্গালয় বাংলা নাটক রচনাকে উৎসাহিত করে।

প্রাক্ মধুসূদন নাট্যপর্বে উল্লেখযোগ্য নাট্যকাররা হলেন—নন্দকুমার রায়, তারাচরণ শিকদার, যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত, হরচন্দ্র ঘোষ, কালীপ্রসন্ন সিংহ, উমেশচন্দ্র মিত্র এবং রামনারায়ণ তর্করত্ন।

● রামনারায়ণ তর্করত্ন (১৮২২-১৮৮৬) :

মধুসূদনের পূর্বে বাংলা নাটকের প্রস্তুতিপর্বে নাটক রচনায় যাঁর খ্যাতি তিনি হলেন 'নাটুকে রামনারায়ণ'। রামনারায়ণ তর্করত্ন বাস্তব ও সরস নাটক রচনার জন্য 'নাটুকে রামনারায়ণ' নামে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন। রামনারায়ণ মূলত সামাজিক সমস্যামূলক নাটক রচনা করলেও পৌরাণিক ও প্রহসন রচনায় তাঁর খ্যাতি যথেষ্ট। তাঁর নাটকের প্রধান সম্পদ হল হাস্যরসের উপস্থাপনা। তাঁর 'কুলীনকুলসর্বস্ব' (১৮৫৪) প্রথম বাংলা সামাজিক নাটক হিসেবে খ্যাতিলাভ করেছে।

রামনারায়ণ সমাজসচেতন নাট্যকার ছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে আমাদের সমাজে যে সংস্কারবাদ বনাম প্রগতিবাদের সংকট দেখা দেয় সে বিষয়ে যাঁরা সক্রিয় ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন রামনারায়ণ। তিনি প্রাচীনপন্থী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজে জন্মগ্রহণ করলেও মানসিকতায় ছিলেন প্রগতিবাদী। কৌলীন্য প্রথা, বিধবা বিবাহ ও সতীদাহ প্রথা প্রভৃতি সম্পর্কে রামনারায়ণের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সমকালীন নবজাগ্রত জীবনচেতনার অনুসারী।

নাট্যকারের রচিত নাটকগুলি হল : (ক) মৌলিক নাটক—‘কুলীনকুলসর্বস্ব’ (১৮৫৪), ‘নবনাটক’ (১৮৫৬), ‘স্বপ্নধন’ (১৮৭৩), ‘ধর্মবিজয়’ (১৮৭৫), ‘কুশ্মিনী হরণ’ (১৮৭১), ‘কংসবধ’ (১৮৭৫)। (খ) প্রহসন : ‘যেমন কর্ম তেমন ফল’ (১৮৬৫), ‘উভয়সঙ্কট’ (১৮৬৯), ‘চক্ষুদান’ (১৮৬৯)। (গ) নাট্যানুবাদ : ‘বেণীসংহার’ (১৮৫৬), ‘রত্নাবলী’ (১৮৫৮), ‘অভিজ্ঞান শকুন্তল’ (১৮৬০), ‘মালতীমাধব’ (১৮৬৭)।

রামনারায়ণের প্রথম নাটক ‘কুলীনকুলসর্বস্ব’। এই নাটকে নাট্যকার কৌলীন্য প্রথার দোষ ও অসঙ্গতিকে উপস্থাপিত করেছেন। রামনারায়ণ নিজেই বিজ্ঞাপনে লিখেছেন—
“পুরাকালে বল্লাল ভূপাল, আবহমান প্রচলিত জাতি মর্যাদা মধ্যে স্বকপোলকল্পিত কুলমর্যাদা প্রচার করিয়া যান, তৎপ্রথায় অধুনা বঙ্গস্থলী যে রূপ দূরবস্থাগ্রস্ত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কোন প্রস্তাব লিখিতে আমি নিতান্ত অভিলাষী ছিলাম.....।”

এই নাটকের কাহিনি হল, এক কন্যাদায়গ্রস্ত ভদ্রলোক চার কন্যার যথেষ্ট বয়স হওয়া সত্ত্বেও তাদের বিবাহ দিতে সক্ষম হন নি। শেষপর্যন্ত এক কুরূপ বৃদ্ধের সঙ্গে কন্যাদের বিয়ে দিতে বাধ্য হন। নাটকটি ছয় ভাগে বিভক্ত। চরিত্রগুলির নাম বেশ কৌতুকময়—অনৃতচার্য, অধর্মরুচি, বিবাহবণিক, উদরপরায়ণ, বিবাহবাতুল, অভব্যচন্দ্র ইত্যাদি। চরিত্রের নামগুলি তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দ্যোতক।

রামনারায়ণ এই নাটকে সংস্কৃত নাটকের অনুসরণ করেছেন। তাই নান্দী অংশে শক্তিবন্দনায় নাট্যকার লিখেছেন,

কুলময়ী কুলরাধ্যা কুলভক্তজন বাধ্য
জগদাদ্যা কুল কুণ্ডলিনী।
অমূল কল্পিত কুল সমূলে করি নিমূল
সত্য কুল-বৃদ্ধি বিধায়িনী।।

নাটকের কাহিনির মধ্যে পরম্পরা কম থাকায় কাহিনির সৃষ্টি হতে পারেনি। নাটকের মধ্যে গুরুগম্ভীর শব্দাঙ্কুরের সঙ্গে সরস ও লঘু ভাষা স্থান পেয়েছে। পুরুষ চরিত্রের চেয়ে নারী চরিত্রের সংলাপ সহজ ও স্বাভাবিক হওয়ায় চরিত্রগুলি জীবন্ত হয়ে উঠেছে। সংলাপ গদ্য ও পদ্যে রচিত। দুঃখময় সাবিত্রীর আত্মবিলাপে সংলাপ হাল্কা জাতীয় হয়ে উঠেছে—

কি বলিব দিদি মোর কপালের গুণ।
দেখ কপালের গুণ লো কপালের গুণ।।
নগরে উঠিতে লাগে বাজারে আগুন।
দিদি বাজারে আগুন লো বাজারে আগুন।।

অন্যদিকে গদ্য সংলাপও বেশ আড়ষ্ট। যেমন,

কুলপালক। (উর্দ্ধ বিলোকন করিয়া)—এ কি মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত, সহস্র-কিরণ সূর্য্য প্রচুর কিরণ প্রদানে আপনার সহস্র-কিরণ নামই কি সার্থক করিতে উদ্যত হইয়াছেন? এখন অনবরত পথপরিশ্রান্ত ও দিনকর কিরণে নিতান্ত ক্লান্ত পাছ লোকেরা সন্তাপ শাস্তি নিমিত্ত

ছায়াপ্রদান পাদপতলে পল্লবশয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রা ভজনা করিতেছে।

নাটকে এই ধরনের কথা সংলাপ ব্যবহারের কৃতিত্ব রামনারায়ণের প্রাপ্য। বিশেষ করে কুলপালক কন্যা তিনটির সংলাপ রচনায় লেখকের দক্ষতা প্রশংসনীয়। আসলে রামনারায়ণ কৌলীন্য প্রথার সমস্যাজনিত কুলীন কন্যাদের জীবনের বিড়ম্বনা সহৃদয়তার সঙ্গে উপলব্ধি করে তাকে নাটকে ব্যক্ত করেছেন। যেমন, কুলপালকের দ্বিতীয় কন্যা কৌলীন্য প্রথার বিষময় ফল সম্বন্ধে আশংকিত হয়ে মাকে বলেছে, “বিয়ের খবর বল্লাল যেন টের না পায়, — কারণ, টের পেলে সে টের পাওয়াবে; সে এমন নয়, যেমন মোল্লা বলে, ‘হেঁদুর পরব নেই’, তেমনি বল্লাল বলে কুলীন বামনের মেয়ের কপালে বিয়ে নাই। তা দেখিস্ সাবধান সাবধান।”

রামনারায়ণ গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে লিখেছিলেন, “ইহা (কুলীনকুলসর্বস্ব) কেবল রহস্যজনক ব্যাপারেই পরিপূর্ণ বটে, কিন্তু আদ্যোপান্ত সমস্ত পাঠ করিয়া তাৎপর্য গ্রহণ করিলে কৃত্রিম কৌলিন্য-প্রথায় বঙ্গদেশের যে দুরবস্থা ঘটিয়াছে তাহা সম্যক অবগত হওয়া যাইতে পারে।”

কৌলীন্য প্রথার ক্ষতিকারক দিক সম্বন্ধে রামনারায়ণ সচেতন ছিলেন বলেই ‘কুলীনকুলসর্বস্ব’ নাটকের মাধ্যমে সমাজে তা তুলে ধরতে প্রয়াসী হয়েছিলেন।

রামনারায়ণের ‘নবনাটক’ বহুবিবাহের বিষময় ফলকে প্রচার করার মানসে রচিত। ঠাকুরবাড়ির রঙ্গমঞ্চে ১৮৬৭ সালের ৫ই জানুয়ারী তা অভিনীত হয়। নাটকটি ঠাকুরবাড়িতেই নয়বার অভিনীত হয়। ‘সোমপ্রকাশ’ পত্রিকায়ও এই অভিনয়ের প্রশংসা করা হয়। নাটকে রামনারায়ণ বৃদ্ধের দ্বিতীয়বার তরুণী ভার্যা বিবাহের কুফল দেখিয়েছেন। দ্বৈগ্ন বৃদ্ধ পিতা ও নিষ্ঠুর বিমাতার অত্যাচারে এই নাটকে শোচনীয় অনেকগুলি মৃত্যু ঘটেছে। নাটকে গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি উপহার-পত্রে লেখা হয়েছে, “ইহা বহুবিবাহ প্রভৃতি বিবিধ কুপ্রথা নিবারণের নিমিত্ত সদুপদেশ সূত্রে নিবদ্ধ”। তবে এটি উদ্দেশ্যমূলক নাটক হওয়ায় তা নাট্যরসের হানিকর বলেই মনে করেন সুকুমার সেন—“প্রকট উদ্দেশ্যমূলকতায় প্লটের সঙ্গতি ও স্বাভাবিকতার হানি হইয়াছে।” আসলে নাটকটি সংস্কৃত নাট্যরীতি অনুযায়ী রচিত। কাহিনির বুনুনি অনেকটা শিথিল। নানা টুকরো টুকরো ঘটনা মূল কাহিনিকে আচ্ছন্ন করেছে। অহেতুক বাগাড়ম্বর ও চরিত্রের অপ্রাসঙ্গিকতায় নাট্যরস ক্ষুণ্ণ হয়েছে। সংলাপের মধ্যেও রয়েছে আড়ম্বল্য। তবে হাল্কা কৌতুক রসের পরিবেশনায় নাট্যকারের কৃতিত্ব যথেষ্ট। যেমন, দুঃখময়ী সাবিত্রীর আত্মবিলাপ—

করিব সংসার সুখে বড় ছিল সাধ।

মনে বড় ছিল সাধ লো বড় ছিল সাধ।।

সে সাধে বিষাদ হলো ঘটিল প্রমাদ।

তাতে ঘটিল প্রমাদ লো ঘটিল প্রমাদ।।

সুতরাং সমকালীন সমাজজীবনের নানা বাস্তব চিত্রের উপস্থাপনায় নাটকটির গুরুত্ব সমধিক হলেও মূল কাহিনির রস নাটকটিতে দানা বাঁধেনি। সেজন্য অজিত কুমার ঘোষ বলেছেন, “বহুবিবাহের ভয়াবহ কুফল দেখাইবার জন্যই নাট্যকার নাটকখানি বিয়োগান্তক করিয়াছেন। সংস্কৃত আদর্শপ্রাপ্ত নাট্যকারের পক্ষে যে ইহা অভিনব সং সাহস তাহাতে সন্দেহ নাই।” (বাংলা নাটকের ইতিহাস—১৯৮৫, পৃঃ—৫৮)

রামনারায়ণ কয়েকটি পৌরাণিক নাটক রচনা করেছিলেন। তার মধ্যে ‘রুক্মিণী হরণ’, ‘কংস বধ’ উল্লেখযোগ্য। ‘রুক্মিণী হরণে’র কাহিনি রামনারায়ণ পুরাণ থেকে গ্রহণ করেছেন, তবে তা হুবহু অনুবাদমূলক নাটক নয়। নাট্যকার নতুন চরিত্র সৃষ্টি করে পৌরাণিক ঘটনাকে

নাট্যরসোত্তীর্ণ করে তুলেছেন। পৌরাণিক চরিত্রের মধ্যে লৌকিক গুণের সমাবেশ করে বাস্তবরসে তাদেরকে উজ্জ্বল করে তুলেছেন। তাদের কথাবার্তা, হাবভাব আমাদের সমাজের অতি পরিচিত মানুষের মতোই ধনদাস চরিত্রের লোভ-লালসা বেশ জীবন্তরূপে চিত্রিত হয়েছে।

অন্যদিকে ‘কংস বধ’ নাটকটি কংস কর্তৃক অক্রুরকে বৃন্দাবনে পাঠানো থেকেই নাটকের আরম্ভ এবং কংস বধ ও উগ্রসেনের পুনরায় সিংহাসন প্রাপ্তিতে নাটকের সমাপ্তি। সংলাপের ক্লাস্তিকরতা ও আধ্যাত্মিক উচ্ছ্বাসের জন্য এই নাটকটি খুব একটা উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠতে পারেনি।

সংস্কৃত নাটকের অনুসরণে অনুবাদমূলক নাটক রচনায়ও রামনারায়ণ সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তার মধ্যে ‘রত্নাবলী’, ‘অভিজ্ঞান শকুন্তলা’ উল্লেখযোগ্য। ‘রত্নাবলী’ নাটকটি চার অঙ্কে বিভক্ত। নাটকটি শ্রীহর্ষের ‘রত্নাবলী’-র অনুবাদ। এটি বেলগাছিয়া নাট্যশালায় ১৮৫৮ সালে অভিনীত হয়েছিল। এই নাটকের অভিনয় দেখেই বাংলা নাট্যসাহিত্যে মধুসূদনের আবির্ভাব। এই নাটকের বিজ্ঞাপনে লেখক তাঁর অনুবাদ রীতির কথা উল্লেখ করেছেন, “‘রত্নাবলী’ নাটকের অবিকল অনুবাদকরণে ক্ষান্ত থাকিয়া মূল গ্রন্থের স্থূলমর্ম মাত্র গ্রহণ করা গেল; এবং কথোপকথনের এতদেশে যেরূপ ভাষা সচরাচর প্রচলিত আছে তাহাই অবলম্বন করিয়া অনুবাদ করিলাম—।” অনুবাদের এই রীতি অন্যান্য অনুবাদমূলক নাটকেও অনুসৃত হয়েছে।

‘রত্নাবলী’ নাটকে দৃশ্যের নাম যেমন ‘প্রকরণ’ তেমনি ‘অভিজ্ঞান শকুন্তলা’ নাটকের দৃশ্যের নাম ‘প্রস্তাব’। এটি সাত অঙ্কে রচিত। ‘রত্নাবলী’ নাটকের থেকে এই নাটকের নাট্যগুণ উন্নততর। শকুন্তলার পতিগৃহ যাত্রাকালে ‘এই আশিষ করি, এই আশিষ করি/বিরহসাগরে পাবে, মিলন পরম তরি’—এই কোরাস গানটি বেশ মনোরম।

‘কুলীনকুলসর্বস্বের’ সাফল্যে রামনারায়ণ কয়েকটি প্রহসন রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ‘যেমন কর্ম তেমনি ফল’, ‘উভয়সঙ্কট’, ‘চক্ষুদান’। এই প্রহসনগুলি রচনার উদ্দেশ্য ছিল সমাজসংস্কার। এজন্য উনিশ শতকের সমাজসংস্কারের স্রোতে তাঁর এই প্রহসনগুলি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

‘যেমন কর্ম তেমনি ফল’ প্রহসনের বিষয় লাম্পটের লাঞ্ছনা। এটি দুই অঙ্কে বিভক্ত। এর সঙ্গে দীনবন্ধুর ‘নবীন তপস্বিনী’র কাহিনির মিল রয়েছে। পরস্পর প্রতি অবৈধ আসক্তি এবং তার হাস্যকর শাস্তি নিয়ে প্রহসনটি রচিত। কৌতুকরস সৃষ্টির ক্ষেত্রে, জলধর চরিত্র নির্মাণে ও নাগর যুগলের করুণ পরিণামের চিত্রণে নাট্যকারের কৃতিত্ব প্রশংসনীয়।

‘উভয়সঙ্কট’ প্রহসনে সপত্নীসমস্যা রূপায়িত হয়েছে। বিষয়বস্তুর উপর পরিহাস স্নিগ্ধ আলোকপাতের মাধ্যমে কৌতুকরস সৃষ্টির প্রয়াস প্রহসনটির মধ্যে লক্ষ করা যায়। বড় বউ, ছোট বউ ও গয়লানী চরিত্রসৃষ্টিতে রয়েছে বাস্তবতার নিদর্শন।

‘চক্ষুদান’ প্রহসনে স্ত্রীর কৌশলে স্বামীর লাম্পট্যবিধির চিকিৎসা বর্ণিত হয়েছে। স্বামী নিকুঞ্জবিহারী স্ত্রীর প্রতি অবহেলা করে অন্য নারীতে আসক্ত। স্ত্রী বসুমতী একদিন এক ছলনার আশ্রয় নিয়ে স্বামীর মনে নব চেতনার সঞ্চার করতে পারল। নিকুঞ্জবিহারীর মাধ্যমে শেষ কথাগুলি হল—“বসুমতি, তুমি আজ কেবল আমাকেই চক্ষুদান দিলে এমন নয়, সঙ্গে সঙ্গে অনেকেরই চক্ষুদান হলো।”

☆ নাট্যকার রামনারায়ণের কৃতিত্ব :

(এক) সমকালীন সামাজিক নানা ব্যাধিকে কেন্দ্র করে রামনারায়ণ নাটক রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। এই সামাজিক দায়বদ্ধতা রামনারায়ণকে দিয়েছে মর্যাদা।

(দুই) শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, “রামনারায়ণ তর্করত্নের ‘কুলীনকুলসর্বস্ব’ (১৮৫৪) প্রথম সার্থক নাটকের গৌরব দাবি করতে পারে। ইহাতে লেখক পুরাণ ও পরাণুকরণ ছাড়িয়া সর্বপ্রথম বাস্তব সামাজিক জীবনে পদক্ষেপ করিয়াছেন।” (বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা—১৯৬৩, পৃঃ—৩৩)

(তিন) পাইকপাড়ার দুই জমিদার ভাই ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ ও প্রতাপচন্দ্র সিংহের উদ্যোগে তাঁদের বাগানবাড়িতে ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে ‘রত্নাবলী’ নাটকের যে অভিনয় হয়েছিল তা বাংলা নাটক রচনায় মধুসূদনের আগমনকে প্রসারিত করেছিল। এছাড়া জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির রঙ্গমঞ্চে তাঁর ‘নবনাটক’ অভিনীত হয়েছিল। ফলে বাংলা রঙ্গমঞ্চের বিকাশে রামনারায়ণের নাটকগুলির বিশেষ গুরুত্ব স্বীকৃত।

(চার) অনুবাদমূলক নাটক ও প্রহসন রচনা করে বাংলার মানুষের নাট্যপিপাসা চরিতার্থ করবার ক্ষেত্রে প্রাক্ মধুসূদন নাট্যপর্বে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

● মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩) :

মধুসূদন ছিলেন প্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব। নাটকের সূত্র ধরেই বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে মহাকবি মধুসূদনের প্রথম আবির্ভাব। মধুসূদনের আবির্ভাবে বাংলা নাটক সংস্কৃত নাটকের প্রভাব থেকে দূরে সরে গেল। মধুসূদনের আবির্ভাবের পূর্বে তখন বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে সংস্কৃত ও ইংরেজি নাটকের অনুবাদ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে গড়ে উঠছিল। রামনারায়ণ তর্করত্নের ‘রত্নাবলী’ নাটকের ইংরেজি অনুবাদও করে দিয়েছিলেন মধুসূদন। অন্যদিকে বেলগাছিয়া নাট্যশালা স্মরণীয় হয়ে থাকবে এই কারণে যে, এই রঙ্গালয়কে কেন্দ্র করে নাট্যসাহিত্যে মধুসূদনের আবির্ভাব। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর ‘রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ’ গ্রন্থে এই বিষয়ে লিখেছেন, “এই নাট্যালয় বঙ্গসাহিত্যে এক নবযুগ আনিয়া দিবার পক্ষে উপায়স্বরূপ হইল। ইহা অমর কবি মধুসূদনের সহিত আমাদের পরিচয় করাইয়া দিল।”

রামনারায়ণের ‘রত্নাবলীর’ অভিনয়ের জন্য যখন প্রস্তুতি চলছিল তখন মধুসূদন ঐ নাটক সম্বন্ধে মন্তব্য করে রাজাদের অর্থব্যয় সম্বন্ধে প্রতিকূল মত প্রকাশ করলে গৌরদাস বসাক বাংলা নাটকের অভাব সম্পর্কে বলেন। তখন মধুসূদন নাটক লেখার প্রস্তাব করেন। মধুসূদনের বাংলা ভাষার প্রতি দখল কম বলেই গৌরদাস বসাক মধুসূদনের কথায় কোন গুরুত্ব দেননি। কিন্তু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর গৌরদাস বসাককে একটি পত্রে লেখেন যে, বিদেশী ভাষা ও সাহিত্যে যাঁর এত অধিকার তিনি নিশ্চয় মাতৃভাষায় চর্চা করলে মাতৃভাষা সমৃদ্ধ হবে। এরপর তিনি ‘শর্মিষ্ঠা’ (১৮৫৯) নাটক রচনা করেন এবং ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চে ‘শর্মিষ্ঠা’ নাটক অভিনীত হয়।

মধুসূদন থেকেই বাংলা নাটকের বিকাশ-পর্ব শুরু হয়। একদিকে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা রক্ষার দাবি, অন্যদিকে ব্যক্তি-স্বাভাব্য এই দুয়ের সংঘাতে বাংলা নাটকের বিকাশপর্ব শুরু। এই সময়ের সঙ্গে এলিজাবেথীয় যুগের নাটকের পরিবেশগত সাদৃশ্য আছে। মধুসূদনের প্রথম নাটক ‘শর্মিষ্ঠা’ প্রকাশিত হয় ১৮৫৯ সালের জানুয়ারী মাসে। রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত মধুসূদনের চিঠি থেকে জানা যায় যে, তা অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করে। মধুসূদন বিজ্ঞাপনে লিখেছিলেন, “Should the drama ever again flourish in India, posterity

will not forget these noble gentlemen, the artist friends of our rising national theatre.”

১৮৫৯ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর তারিখের এক পত্রে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর গৌরদাস বসাককে লেখেন, “The representation of the drama of Sharmistha has come off gloriously. Night before last was the sixth of last night of its performances.”

তখনকার বঙ্গেশ্বর জন পিটার গ্র্যান্ট, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিগণ ও অন্যান্য বিশিষ্ট ইংরেজ রাজকর্মচারী অভিনয় দেখতে গিয়েছিলেন। মধুসূদন এই নাটক সম্পর্কে রাজনারায়ণ বসুকে লেখেন, “This Sharmistha has very neatly put me at the head of all Bengali writers. People talk of its poetry with rapture.” নাটকটি অবশ্য তাঁর মেয়ের নামে নামাঙ্কিত।

‘শর্মিষ্ঠা’ নাটকের কাহিনি মহাভারতের আদি পর্বের অন্তর্ভুক্ত। তা শর্মিষ্ঠা-যযাতি-দেবযানীর কাহিনি থেকে নেওয়া হয়েছে। নাটকের কাহিনি এরকম—কচ প্রদত্ত সঞ্জীবনী বিদ্যায় দেবতার বলীমান হলেন। এক সময় ইন্দ্র সুন্দর এক কাননের ভিতরে অবস্থিত সরোবরে স্ত্রীলোকদেরকে জলবিহারে রত দেখে তিনি তাঁদের পরার কাপড়গুলি মিশিয়ে দিলেন। শর্মিষ্ঠা ভুলবশত দেবযানীর কাপড় পরলে তিনি রুষ্টা হন। শর্মিষ্ঠাও ক্রুদ্ধ হয়ে দেবযানীর বাবা শুক্রাচার্য তার পিতার অন্তে জীবিকা নির্বাহ করে বলে জানায়। এরপর দেবযানী তাকে টেনে ধরলে শর্মিষ্ঠা দেবযানীকে কূপে নিক্ষেপ করে। এই সময় মৃগয়াবিহারী রাজা যযাতি দেবযানীকে কূপ থেকে উদ্ধার করেন। এরপর বিচারে শর্মিষ্ঠা দেবযানীর দাসী নিযুক্ত হয়। শর্মিষ্ঠাকেও যযাতি বিবাহ করেন—শুক্রাচার্যের নিষেধ সত্ত্বেও। ফলে তিনি শুক্রাচার্যের অভিশাপগ্রস্ত হন। এজন্য যযাতি অকালে জরাগ্রস্ত হন কিন্তু সেই জরা পুত্রকে দিয়ে তিনি শাপমুক্ত হতে পারবেন। সেই মতো যযাতি পাঁচ পুত্রের মধ্যে এই সংবাদ পৌঁছে দিলেন যে, যে পুত্র তার জরা নেবে সে সাম্রাজ্য ভোগ করবে। সেইমতো শর্মিষ্ঠার পুত্র পুরু পাপের সঙ্গে জরা গ্রহণ করে পরম সুখে দিনাতিপাত করার আশীর্বাদ গ্রহণ করলেন রাজা যযাতির কাছ থেকে। এখানেই কাহিনির সমাপ্তি। পাঁচ অঙ্কে ও তের গর্ভাঙ্কে এই কাহিনি বিন্যস্ত।

নাট্যশিল্পের প্রয়োজনে মহাভারতের কাহিনির পরিবর্তন সাধন করেছেন মধুসূদন। নাট্যকার এই নাটকে ভারতীয় আলংকারিক রীতি অনুসরণ না করে পাশ্চাত্য রীতি গ্রহণ করেছেন। তাই কাহিনি উপস্থাপনে শেক্সপিয়র কথিত পঞ্চসন্ধি রীতি মান্য করা হয়েছে। তবে নাটকটি বর্ণনামূলক হওয়ায় এবং এর সংলাপ প্রাণবন্ত না হওয়ায় এই নাটকের রসাবেদন অনেকাংশে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। যেমন, যযাতির জরা গ্রহণের বৃত্তান্ত বর্ণনার মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে।

চরিত্র চিত্রণের ক্ষেত্রেও নাট্যকার বিশেষ পারদর্শিতা দেখাতে পারেন নি। মূল মহাভারতে যযাতির চরিত্র বলিষ্ঠ, প্রাণরসে পূর্ণ, ভোগতপ্ত হয়েও সংযত। মধুসূদন যযাতিকে বীর্যবান পুরুষ হিসেবে চিত্রিত করতে চাইলেও তাঁর প্রেমিক রূপটি পরিস্ফুট হয়েছে বেশি। দেবযানীকে দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন, কারণ তিনি রূপোন্মত্ত রাজা। এছাড়া রাজার চরিত্রে মধুলোভী ভ্রমরের বৃত্তিও চিত্রিত হয়েছে। নাটকের প্রয়োজনে নাট্যকার যযাতি চরিত্রের কিছু পরিবর্তন সাধন করেছেন। তাঁর চরিত্রে কোন অন্তর্দ্বন্দ্ব নেই, দুই নারীকে কেন্দ্র করে চরিত্রে জটিল সংঘাতও সৃষ্ট হয়নি। শুধু দেবযানীর ব্যবহারে শুক্রাচার্যের অভিশাপ আশঙ্কায় তাঁর মধ্যে কিছুটা মানসিক সন্তাপ দেখা যায়।

অন্যদিকে শর্মিষ্ঠা চরিত্রটি মহাভারতে যেমন নিজ আভিজাত্য নিয়ে উপস্থিত তা নাটকে পরিবর্তিত হয়ে বাঙালি নারী রূপে চিত্রিত। কারণ নাটকের শর্মিষ্ঠার মধ্যে পাই ব্রীড়ার সঙ্গে কোমলতা, সহিষ্ণুতার সঙ্গে প্রশান্তি এবং প্রেমের সঙ্গে কল্যাণকামনা। তাঁর চরিত্র যেন ধৈর্য বাঙালির পারিবারিক জীবনের শক্তিরূপিণী নারীর স্বরূপ চিত্রিত হয়েছে।

শর্মিষ্ঠা চরিত্রের বিপরীতে দেবযানীর উপস্থিতি। এই চরিত্র চিত্রণের ক্ষেত্রেও মূল মহাভারত থেকে সরে এসেছেন নাট্যকার। দেবযানী পতির প্রতি ভালোবাসা জ্ঞাপন করলেও তিনি অসহিষ্ণু ও আত্মসচেতন। শর্মিষ্ঠার প্রতি তাঁর অসূয়া তাঁকে স্বামীর প্রতি কঠোর করে তুলেছে। চরিত্রটির মনস্তাত্ত্বিকতা বস্তুনিষ্ঠার সঙ্গে চিত্রিত।

শুক্রাচার্য মহাভারতে ধর্মনিষ্ঠ, তেজস্বী ব্রাহ্মণের চরিত্র। কিন্তু মধুসূদন শুক্রাচার্যের চরিত্রে পিতৃসত্তার পরিচয়কে বিশেষভাবে দেখিয়েছেন। বিদূষক চরিত্রটিও কালিদাসের শকুন্তলা নাটকের মাধব্যের আদলে রচিত। এই চরিত্র চিত্রণে নাট্যকারের বাস্তববোধের প্রমাণ মেলে।

‘শর্মিষ্ঠা’ ক্লাসিক্যাল আদর্শে রচিত, তবুও তিনি সংস্কৃত নাটকের আদর্শ অনুসরণ করতে চাননি। এমনকি সংস্কৃত রীতির সংলাপও বর্জন করতে চেয়েছিলেন। তাই গভাঙ্ক বিভাগ গ্রহণ করেছেন ও সূচনা অংশের নান্দী প্রবেশ প্রভৃতির পরিহার করেছেন। পাশ্চাত্য আদর্শে নাট্যকাহিনিকে আদি-মধ্য-অন্ত্য পর্বে বিন্যস্ত করেছেন। তবুও সংস্কৃত নাটকের প্রভাব ‘শর্মিষ্ঠা’য় রয়েছে। যেজন্য ‘রত্নাবলী’ নাটকের প্রভাব এই নাটকে দেখা যায়। প্রস্তাবনা ও উপসংহার সংস্কৃত রীতি অনুযায়ী রচিত। বিদূষক চরিত্রও সংস্কৃত নাটকের আদলে রচিত। এই নাটকে কালগত ঐক্য রক্ষিত হয়নি। যেমন রাজা যযাতির দেবযানীর সঙ্গে বিয়ের বহু পর তৃতীয় অংক শুরু হয়েছে। তবে স্থান ও ভাবগত ঐক্য রক্ষার ক্ষেত্রে নাট্যকার পাশ্চাত্য নাট্যাদর্শকে গ্রহণ করেছেন।

‘শর্মিষ্ঠা’ নাটক গদ্যে লেখা। এই গদ্য ভাষার কোন আদর্শ তিনি তুলে ধরতে পারেন নি। মধুসূদন রূপবর্ণনার ক্ষেত্রে কালিদাসকে অনুসরণ করেছেন। এই নাটকে সংলাপের ক্ষেত্রে যে আড়ম্বৃত্য তার কারণ কবিত্বপূর্ণ বর্ণনা ও আলংকারিক বাক্য বিন্যাস। এজন্য দীর্ঘ সংলাপ ও স্বগতোক্তির ব্যবহার করেছেন। সুতরাং ‘শর্মিষ্ঠা’ নাটকে নানা ত্রুটি থাকলেও বাংলা নাটকের বিকাশ পর্বে এই নাটক স্মারকচিহ্ন হয়ে থাকবে।

১৮৬০ সালের মে মাসে ‘পদ্মাবতী’ নাটকের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। সুন্দরী নারীর স্বাভাবিক ঈর্ষা নিয়ে এই নাটকটি রচিত। এই নাটকের কাহিনি গ্রীক পুরাণ থেকে গৃহীত। তবে ভারতীয় পরিবেশের আদলে তিনি এই কাহিনিকে সাজিয়েছেন। শচী, রতি, মুরজা এই তিন সুন্দরী নারীর মধ্যে পারস্পরিক কলহ সৃষ্টির জন্য নারদ সোনার আপেল সুন্দরীশ্রেষ্ঠা পাবে এই ঘোষণা করেন। রাজা ইন্দ্রনীলের উপর বিচারের ভার পড়ে এই তিনজনের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ তা জানাতে। ইন্দ্রনীল রতির পক্ষে রায় দেন ও সুন্দরীশ্রেষ্ঠা পদ্মাবতীকে লাভ করেন। কাহিনিটি রূপকথাধর্মী। মূল কাহিনির সঙ্গে আর একটি কাহিনি যুক্ত হয়েছে। এই কাহিনির গুরুত্বও সমধিক। রতির প্রভাবে স্বপ্নযোগে ইন্দ্রনীল ও পদ্মাবতী উভয়ে উভয়কে দেখে অনুরক্ত হন। চিত্রকরীর ছদ্মবেশে রতি ইন্দ্রনীলের প্রতিমূর্তি দেখে পদ্মাবতী মূর্ছিত হন। এই দ্বিতীয় কাহিনিটি প্রথম কাহিনির সূত্রে এসেছে। নাট্যকার মূল কাহিনি থেকে বিচার দৃশ্যও পরাভূত দুই দেবীর ক্রোধজাত প্রতিক্রিয়াকে গ্রহণ করেছেন। গ্রীক পুরাণের কামনালব্ধ প্রেমকাহিনির পরিণতিকে নাটকে গ্রহণ না করে মধুসূদন তাকে জীবনের

লীলাচঞ্চল তরঙ্গভঙ্গে স্থাপন করেছেন। তিনি বিরহ-সন্তপ্ত নায়ক-নায়িকার প্রণয়কাহিনিকে গুরুত্ব দিয়েছেন।

‘পদ্মাবতী’ মোটামুটিভাবে সংস্কৃত নাটকের আদর্শে রচিত। কালিদাসের শকুন্তলা নাটকের দ্বারা তিনি প্রভাবিত হয়েছেন। যেমন, ধনুর্বাণ হাতে রাজা ইন্দ্রনীলের প্রবেশ ও হরিণের পলায়ন দুয়ুস্তের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। শকুন্তলার ষষ্ঠ অঙ্কের সাদৃশ্যে ‘পদ্মাবতী’র দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে কঞ্চুকী ও সখীর কথোপকথন বর্ণিত। পদ্মাবতী ও ইন্দ্রনীলের বিরহ-দুঃখের বর্ণনায়ও কালিদাসের ছাপ স্পষ্ট।

ভারতীয় রীতি মেনেই মধুসূদন নাটকের পাত্র-পাত্রীদের নামকরণ করেছেন। ‘পদ্মাবতী’তেও মধুসূদন সংস্কৃতের ধারা অনুসরণ করে শৃঙ্গার বা প্রেম-রসকে মুখ্য স্থান দিয়েছেন। ঘটনা সংস্থাপন ও চরিত্র বর্ণনার দিক থেকে মধুসূদন কালিদাসকে অনুসরণ করেছেন। ভাষাও সংস্কৃতানুগ।

সংলাপ ব্যবহারের ক্ষেত্রে এই নাটকে নাট্যকার পূর্বের নাটকের থেকে বেশি পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। এই নাটকে প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার করেন তিনি। যেমন,

কলি— পালিনু তোমার আজ্ঞা যতনে ইন্দ্রাণী।

বিদায় করহ তবে যাই স্বর্গপুরে।

শচী— (ব্যগ্রভাবে) কোথায় রেখেছ তাকে?

কলি— এই ঘোর বনে

সখী সহ আনি তাকে রেখেছি, মহিষি!

(সহাস্য বদনে)

রথে করে তুলি দোঁহে উঠিনু আকাশে

কত যে কাঁদিলে ধনী, করিলে মিনতি,

সে সকল মনে হলে—হাসি আসে মুখে।

‘পদ্মাবতী’ নাটকে ভাবগত ঐক্য পরিণাম অনুসারী। এটি একটি কমেডি নাটক। গ্রীক পুরাণের কাহিনি গ্রহণ করলেও তিনজন দেবী চরিত্র শচী, মুরজা ও রতি, হেরা আফ্রোদিতে ও প্যালাস এথেনীর আদর্শে সৃষ্টি করেছেন নাট্যকার। তবে দেবীদের আচরণের মধ্যে গ্রীক দেবীদের সাদৃশ্য রয়েছে। শচীর মধ্যে আত্মগরিমা যথেষ্ট। মুরজা সহানুভূতি সম্পন্ন ও দয়ালু। রতি মন্থমোহিনী বলে গর্বময়ী। গ্রীক দেবকুলের মতো এদের মধ্যে উচ্চতর নীতিবোধ নেই, আছে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ঈর্ষ্যা ও ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার প্রয়াস। স্ত্রীজনোচিত কলহপ্রবণতা, অপরের সৌভাগ্য দর্শনে অসূয়া ও আত্মাভিমান এদের মধ্যে প্রবল। দেবর্ষি নারদকে লৌকিক সংস্কার অনুযায়ী নাট্যকার সৃষ্টি করেছেন। ইন্দ্রনীল চরিত্রে প্যারিসের প্রভাব কম কিন্তু দুয়ুস্তের প্রভাব একটু বেশি বলে মনে হয়। অলংকারশাস্ত্র মেনে মধুসূদন ইন্দ্রনীলকে ধীরোদাত্ত নায়করূপে অংকন করেছেন। তবে ইন্দ্রনীল চরিত্রে কোন জটিলতা নেই। পদ্মাবতীর চরিত্রে কোন বৈশিষ্ট্য নেই, নেই আন্তর্দ্বন্দ্ব। করুণা ও কোমলতা পদ্মাবতী চরিত্রের সম্পদ। সামগ্রিকভাবে চরিত্রসৃষ্টিতে কোথাও কোথাও উচ্চাঙ্গের পরিকল্পনার আভাস থাকলেও কোন চরিত্র সম্পূর্ণতা লাভ করেনি।

মধুসূদনের তৃতীয় নাটক ‘কৃষ্ণকুমারী’র রচনাকাল ১৮৬০ সালের সেপ্টেম্বর এবং এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৬১ সালের শেষের দিকে। কেশবচন্দ্রকে লিখিত এক পত্রে তিনি ‘কৃষ্ণকুমারী’ রচনার প্রেরণা ব্যাখ্যা করেন। তিনি দু’রাত্রি টডের রাজস্থানের ইতিহাস পাঠ করেছেন। বিগত রাত্রে একটার সময় কাব্যলক্ষ্মী প্রসন্না হলেন। এর বিষয়বস্তু তাঁর

মনকে উৎফুল্ল করে তুলেছিল। তিনি লিখেছিলেন 'What a romantic tragedy it will make.' বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চে কৃষ্ণকুমারী অভিনীত হয় মধুসূদনের ইচ্ছায়। কেশবচন্দ্রকে একটি পত্রে তিনি লিখেছিলেন, 'What I want is to have it acted by such an actor as your noble self.' ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারী শোভাবাজার নাট্যশালায় 'কৃষ্ণকুমারী' মঞ্চস্থ হয়। অভিনয়ের পর ১১ই ফেব্রুয়ারীতে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায় এই নাটক সম্বন্ধে লিখেছিল, 'কৃষ্ণকুমারী' বাংলা ভাষায় রচিত মৌলিক ও সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক। এরপর জোড়াসাঁকো নাট্যশালা এবং ন্যাশানাল থিয়েটারে তা অভিনীত হয়।

'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের কাহিনি টডের রাজহান থেকে গৃহীত। মূল কাহিনি ইতিহাস থেকে সংগৃহীত হলেও মধুসূদন এর ঐতিহাসিক পরিবেশ অক্ষুণ্ণ রেখে একে রোমান্টিক ট্রাজেডির রূপ দিয়েছেন। ঐতিহাসিক ট্রাজেডি হিসেবে এটি প্রথম নাটক। এই নাটকেই প্রথম নাট্যকার সম্পূর্ণরূপে পাশ্চাত্য রীতি অনুসরণ করেছেন। রাণা ভীমসিংহের কুমারী কন্যা কৃষ্ণ রাজ্যের কল্যাণে এবং পিতাকে দারুণ বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য দ্বৈত আত্মত্যাগ ও তার-ই পরিণামী ঘটনা এই নাটকের প্রধান বিষয়বস্তু। মধুসূদন টডের ইতিহাস থেকে মেবারের এমন এক সঙ্কটপূর্ণ অধ্যায় নির্বাচন করেছেন যা তার চরম দুর্ভাগ্যের কাহিনিকেই তুলে ধরে। কৃষ্ণর অকালমৃত্যু শোকাবহ ও নিষ্ঠুর ঘটনা সন্দেহ নেই, কিন্তু এর ব্যঙ্গনা ব্যাপকতর। এর মধ্য দিয়ে মেবারের নির্বাপিতপ্রায় শেষ স্নান রশ্মিটুকু নিলিয়ে যাওয়ার করুণ কাহিনি ব্যক্ত হয়েছে।

'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে মধুসূদনের জাতীয়তাবাদের সুর উচ্ছ্বসিত হয়ে ঐতিহাসিক রসকে আচ্ছন্ন করেনি। নাট্যকারের কৃতিত্ব এই যে, তিনি ইতিহাসের তথ্য অক্ষুণ্ণ রেখে একাধারে ভীমসিংহের ট্রাজিক পরিণাম, দেশ ও জাতির কল্যাণের জন্য কৃষ্ণর আত্মদান, কন্যার শোকে রাজমহিষীর মৃত্যু এবং অন্যদিকে ঐতিহ্যমণ্ডিত কিন্তু হতগৌরব মেবারের অনুরূপ বিপর্যয়ের কাহিনি তিনি বর্ণনা করেছেন।

মধুসূদন কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে একটি পত্রে লিখেছিলেন, "The story of Krishna though tragic, is barren of incidents." একথা সত্য যে ভীমসিংহের রাজত্বকালে উদয়পুর অত্যন্ত দুর্বল ও অসহায় হয়ে পড়েছিল। রাজশক্তি দুর্বল, কোষাগার অর্থশূন্য, রাজ্য বীরশূন্য। এর ফলে রাণা ভীমসিংহের জীবন হয়ে উঠেছিল দুর্বিষহ। মধুসূদন ইতিহাসকে পটভূমিকায় রেখে রাণা ভীমসিংহ ও তাঁর পরিবারের কাহিনি অংকন করেছেন। নাট্যকারের কৃতিত্ব এখানে যে, তিনি এই কাহিনিকে সমগ্র রাজ্যের আসন্ন বিপর্যয়ের সঙ্গে সংযুক্ত করে ব্যক্তিজীবন ও জাতীয় জীবনের বাস্তব পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন।

কুমারী কৃষ্ণর জীবনকে কেন্দ্র করে এই নাটকে ট্রাজেডি সংঘটিত হয়েছে। পঞ্চমাস্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে বলেদ্রসিংহের কাছ থেকে কৃষ্ণ উদয়পুরের বিপদের কথা জানতে পারেন। পদ্মিনীর আহ্বান শুনতে পেয়ে তিনি তাঁর পিতাকে বলেন, "পিতা, আপনি এ সামান্য বিষয়ে এত আক্ষেপ করেন কেন? জীব মাত্রেরই শমনের অধীন। তা এতে দুঃখ কল্যে আর কি হবে? জীবন কখনই চিরস্থায়ী নয়।" টডের ইতিহাসেও কৃষ্ণ এ ধরনের কথা তাঁর মাকে বলেছেন। টড লিখেছেন যে, কুমারী 'Was resigned to her fate.' এই সূত্র ধরে কৃষ্ণর মানসিক সংঘাত মধুসূদন পরিস্ফুট করতে পারলে তাঁর চরিত্র ও ট্রাজেডির আবেদন মর্মস্পর্শী হতে পারত। বিশেষ করে কৃষ্ণর ট্রাজেডি তাঁর নিজের কোন ভুলের জন্য সংঘটিত হয়নি কিংবা পারত। বিশেষ করে কৃষ্ণর ট্রাজেডি তাঁর নিজের কোন ভুলের জন্য সংঘটিত হয়নি কিংবা তার কোন কাজের জন্যও অনিবার্য হয়ে ওঠেনি। বরং মদনিকা, ধনদাস প্রভৃতি অপ্রধান চরিত্রই নাটকের বিষাদাস্ত পরিণতির জন্য দায়ী। তাই কৃষ্ণকুমারীকে ট্রাজিক নায়িকার পর্যায়ে ফেলা যায় না।

ভীমসিংহকে বরং নায়ক বলা যায়। কারণ নায়কের doing ও suffering তারই। তবে ভীমসিংহ প্রথম থেকেই অসহায় ও দুর্বল চিত্ত। কিন্তু তাঁর চরিত্রে কোন একদেশদর্শিতা নেই। এমনকি বিরূপ ভাগ্যের বিরুদ্ধে তাঁর মধ্যে কোন সংগ্রামের প্রয়াস নেই। শৈলরাজের বংশধর হয়েও মহারাষ্ট্রাধিপতির সঙ্গে অমর্যাদাকর সন্ধি করেছেন। সত্যদাস যখন প্রজাদের হিতের জন্য ও বংশের মান রক্ষার কারণে কৃষ্ণর আত্মবিসর্জনের প্রস্তাব দেন তখন রাণার মধ্যে প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে। তবে মধুসূদন শেষ পর্যন্ত রাণা ভীমসিংহকে অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় রাখায় রাণার ট্রাজেডির মর্মভেদী বেদনা তাঁকে আশ্রয় করে গড়ে উঠতে পারেনি। তবে শেষ পর্যন্ত এক কারুণ্য রাজ পরিবার থেকে সমগ্র রাজ্যে পরিব্যাপ্ত হয়ে দেশ ও জাতির জীবনে বিস্তার লাভ করেছে।

‘কৃষ্ণকুমারী’ নাটক টডের রাজস্থান থেকে মধুসূদন কাহিনি সংগ্রহ করলেও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য প্রভাবের দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছেন। যেমন, ক) ইউরিপিডিসের Ifigenia in Aulis নাটকের ইফিগেনিয়ার পরিণামের মিল রয়েছে।

খ) পঞ্চমাস্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে রাণা ভীমসিংহের মানসিক আলোড়নের সঙ্গে ‘কিং লিয়ার’ নাটকের লিয়ারের মানসিক দ্বন্দ্বের সামান্য সাদৃশ্য আছে। ভীমসিংহ বলেছেন, ‘হে নিশাদেবি। এ পাষাণকে পৃথিবীতে আর কেন রাখ। বিলাপ কর। কৈ এখনও বজ্রাঘাত হলো না? কৈ বিলম্ব কেন?’

লিয়ার বলেছেন,

You Sulphurous and thought excuting fires

Singe my white head!

And thou, all-shaking thunder,

Strike flat the thick rotundity O'th' world!

গ) মদনিকার পুরুষের ছদ্মবেশে উদয়পুরে অবস্থিতি ও ধনদাসকে প্রতারণা করা ‘As you like it’ নাটকের রোজালিন্ডকে স্মরণ করায়।

‘কৃষ্ণকুমারী’ নাটকে প্রাচ্য প্রভাবও লক্ষ করা যায়। কেননা, এই নাটকে মধুসূদন পৌরাণিক প্রসঙ্গ ও উপমা প্রভৃতি ব্যবহার করেছেন। জগৎসিংহের মুখে দাশরথির প্রসঙ্গ, দুরাত্মা রাবণের প্রসঙ্গ এসেছে। রাজা জগৎসিংহ ধনদাসকে দৌত্যকার্যে উদয়পুরে পাঠানো প্রসঙ্গে তাকে দময়ন্তীর কাছে নলরাজা কর্তৃক প্রেরিত রাজহংসের সঙ্গে উপমিত করায় চতুর ধনদাস বলেছে যে, ‘তাহার সোনার পাখা ছিল কিন্তু এ দাসের কি আছে মহারাজ?’ অন্যদিকে তপস্বিনীর নাম কপালকুণ্ডলা রেখেছেন ভবভূতির ‘মালতী-মাধবের’ অনুসরণে।

মধুসূদনের জীবনচরিতকার যোগীন্দ্রনাথ বসু লিখেছেন, “‘কৃষ্ণকুমারী’ নাটকের বারাদনা মদনিকার ও বিলাসবতীর চরিত্র মধুসূদন সম্ভবতঃ মৃচ্ছকটিকের মদনিকার ও বসন্তসেনার আদর্শে গঠিত করিয়াছিলেন।” কৃষ্ণর চরিত্রে শকুন্তলার প্রভাব রয়েছে। বৃক্ষলতার সঙ্গে শকুন্তলার যেমন সম্পর্ক তেমনি সম্পর্ক কৃষ্ণর। তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে কৃষ্ণ বলেছেন, “আমি এই মল্লিকা ফুলটিকে আদর করে বন বিনোদিনী নাম দিয়েছিলাম। এই সুচারু শমীবৃক্ষটিকে সখী বলে বরণ করেছিলাম।”

‘শর্মিষ্ঠা’ ও ‘পদ্মাবতী’র তুলনায় কৃষ্ণকুমারীর ভাষা সরল, সংযত ও চরিত্রানুগ হয়েছে। তপস্বিনী তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে মানসিংহের প্রতি কৃষ্ণর অনুরাগের কথা মহিষী অহল্যাবাদিকে বলেছেন, “মহিষি, লজ্জা যুবতীর হৃদয়মন্দিরে দৌবারিক স্বরূপ। তার

পরাভব করা কি সহজ কর্ম?" কোন কোন ক্ষেত্রে অলঙ্কৃত ভাষার প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। রাণা ভীমসিংহের উক্তি, "কোন কোন সাগরে ঝড় অনবরতই বইতে থাকে; তা এদেশেরও কি সেই দশা ঘটলো।"

চরিত্রচিত্রণের দিক থেকে 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে নাট্যকার কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। উদয়পুরের রাণা ভীমসিংহ নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র। একদিকে কুলের মর্যাদা ও অন্যদিকে জাতির কল্যাণ সাধন এই উভয় দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তিনি অসহায়ভাবে পরিস্থিতির সাক্ষী হয়ে গেছেন। অপরদিকে জগৎসিংহ ভীমসিংহের বিপরীত চরিত্র নয়। জগৎসিংহ সম্বন্ধে নাট্যকার একটি পত্রে লিখেছিলেন, "I have tried to represent Juggutsing as I find him in History, a somewhat silly and voluptuous fellow." আবার ধনদাসের অর্থলোলুপতা, চাতুর্য, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা উজ্জ্বল রেখায় চিত্রিত। বলেন্দ্রসিংহ রাজভ্রাতা ও সেনাপতি। মধুসূদন তাঁকে শেক্সপিয়রের King John নাটকের বান্টার্ড চরিত্রের আদর্শে গড়ে তুলতে চেয়েছেন। কৃষ্ণকুমারী নাটকের নায়িকা। ইতিহাস থেকে প্রেরণা নিয়ে মধুসূদন তাঁকে 'dignified yet gentle' রূপে অঙ্কিত করতে চেয়েছেন। সে যাই হোক, 'কৃষ্ণকুমারী' মধুসূদনের যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

☆ প্রহসন :

মধুসূদনের বিচিত্রধর্মী প্রতিভার উজ্জ্বল নিদর্শন হল তাঁর প্রহসন দুটি। উনিশ শতকের মধ্যভাগে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে বাঙালি জাতীয় জীবনে এক আমূল পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। ইংরেজি শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাব বাঙালি জাতিকে মানবিকতার নতুন জগতে যেমন মুক্তি দিয়েছিল, তেমনি ইংরেজদের অনুকরণের ফলে এক পচনশীল ও অনুবিকার এই নব্যপন্থীদের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠেছিল। আচারে-ব্যবহারে, খাদ্যে-পানীয়ে, আমোদে-প্রমোদে তারই নিষ্ফল অনুকরণ বাঙালি জীবনে এক বিশাল অন্তঃসারশূন্যতাকে প্রবল করে তুলেছিল। ইয়ংবেঙ্গলের সভ্যদের এই ব্যবহারিক অনাচার ও চারিত্রিক ভ্রষ্টতা মধুসূদন ও দীনবন্ধু মিত্রের প্রহসন রচনার উৎস বলে মনে করা যেতে পারে। অবশ্য মধুসূদনের প্রহসন রচনার পেছনে ছিল দর্শকদের আকাঙ্ক্ষা। দর্শকরা বিচিত্র রসের নাটক চাইতেন বলেই ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ ১৮৫৯ সালে মধুসূদনকে লিখেছিলেন, প্রহসন জাতীয় নাটক রচনা করতে। মধুসূদনের দুটি প্রহসন 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রৌ' ১৮৬০ সালে প্রকাশিত হয়। প্রহসন দুটিতে মধুসূদনের অসামান্য নাট্য প্রতিভার পরিচয় রয়েছে।

'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনের আলোচ্য বিষয় ইয়ংবেঙ্গল সমাজের পদস্বলন। মধুসূদন সমকালীন সমাজজীবনে যে সুসংহত জীবনাদর্শের অভাব লক্ষ করেছিলেন তাকেই এই প্রহসনে উপস্থাপিত করেছেন। রামনারায়ণের 'কুলীনকুলসর্বস্ব'-র প্রেরণায় মধুসূদন সামাজিক সমস্যা নিয়ে প্রহসন দুটি রচনা করেন। 'একেই কি বলে সভ্যতা' রচনার পর সেকালের পত্র-পত্রিকায় ও মনীষীদের সমালোচনায় বিশেষরূপে তা প্রশংসিত হয়। বিবিধার্থ সংগ্রহে রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্র, 'বাদ্দালা ভাষা ও বাদ্দালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব'-এ রামগতি ন্যায়রত্ন এই প্রহসনকে বাংলা ভাষায় সর্বোৎকৃষ্ট রচনা বলে উল্লেখ করেছেন।

'একেই কি বলে সভ্যতা'য় কাহিনির ধারাবাহিকতা নেই, কিন্তু বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে সমাজজীবনের একটি চিত্র অত্যন্ত সার্থকভাবে চিত্রিত হয়েছে। দুই অঙ্ক ও চারটি গর্ভাঙ্কে কাহিনি সমাপ্ত হয়েছে। বিচিত্র ঘটনার সমাবেশে নাট্যকার এই প্রহসনে নব্য-বঙ্গ সমাজের

পরিচয় পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। কাহিনির সুযম বিন্যাস, চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও চরিত্রানুগ সংলাপ বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে। স্বল্প পরিসরে নাট্যকার শিক্ষিত বাবু সমাজের আত্মাভিমান, সামাজিক সংস্কারের নামে উচ্ছৃঙ্খল আচরণ ও জ্ঞানতরঙ্গিনী সভার নামে মজা লোটোর ব্যঙ্গচিত্র পরিহাস রসিকতার সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে। এই প্রহসন রচনায় নাট্যকারের নিরাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গী, আত্মপ্রত্যয় ও মানবপ্রীতির পরিচয় সহজলভ্য।

নব্যশিক্ষিত বাবুদের ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ ‘একেই কি বলে সভ্যতা’র নাট্যরূপ পেয়েছে। স্বাধীনতার নামে প্রগলভ আচরণ, উচ্ছৃঙ্খল ভোগাকাঙ্ক্ষা ও পানাসক্তি কিভাবে একাংশের মানুষের মধ্যে অবক্ষয়কে ডেকে এনেছিল তারই বাস্তব নাট্যরূপ এই প্রহসন। সমকালীন উচ্ছৃঙ্খল নব্য যুবকদের জ্ঞানতরঙ্গিনী সভায় মিলিত হয়ে যে সব কীর্তিকলাপ করত তার বাস্তব দলিল এই প্রহসন। বিশেষ করে শেষ গর্ভাঙ্কে পারিবারিক জীবনের দুর্যোগের ছবিটি সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে।

প্রহসনে চরিত্রসৃষ্টির অবকাশ যথেষ্ট না থাকলেও নাট্যকার এই প্রহসনে জ্ঞানতরঙ্গিনী সভার সভ্যবৃন্দের শ্রেণিরূপ বজায় রেখেও সুকৌশলে তাদের সংলাপ ও আচরণের মাধ্যমে ব্যক্তিরূপকে তুলে ধরেছেন। শ্রেণিগত পরিচয় তাদের মনোভাব, কথাবার্তা ও আচরণের মধ্যে ধরা পড়েছে। নবকুমার জ্ঞানতরঙ্গিনীর নেতা ও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। সে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত, বুদ্ধিমান ও ধৈর্যশীল। জ্ঞানতরঙ্গিনী সভায় যাওয়ার আগে ও পরে তার মানসিক প্রতিক্রিয়ার দুটি ভিন্ন চিত্র চরিত্রটিকে জীবন্ত করে তুলেছে। কালীনাথ নবকুমারের মত একজন বিশিষ্ট সভ্য। অন্যদিকে মহেশ ও বলাই নব ও কালীর কঠোর সমালোচক। গৃহের কর্তা নিষ্ঠাবান বৈয়গ্যব। তাঁর দৃষ্টিতে, এ কলকাতা মহা পাপনগর—কলির রাজধানী, এখানে কি কোন ভদ্রলোকের বসতি করা উচিত? বাবাজী যেন তুলসী বনের বাঘ। নব-র মা বাঙালি ঘরের জননী। যে জননী পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায় কাতর, ভবিষ্যতের চিন্তায় শঙ্কাতুর ও সব রকমের বিপদ-আপদ থেকে তাকে রক্ষা করার জন্য ব্যাকুল। নব-র বোন প্রসন্ন ও স্ত্রী হরকামিনীর উদ্ভিতে প্রহসনের মূল বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। প্রসন্ন বলেছে, ‘জ্ঞানতরঙ্গিনীর সভাতে এই রকম জ্ঞান-ই হয়ে থাকে’। হরকামিনী বলেছে, ‘এমন স্বামী থাকলিই বা কি, আর না থাকলিই বা কি’। তার মুখে নব্য শিক্ষিত যুবকদের প্রতি ধিক্কার বাণী উচ্চারিত হয়েছে, ‘মদ মাস খেয়ে ঢলাঢলি কল্লোই কি সভ্য হয়? —একেই কি বলে সভ্যতা?’

আলোচ্য প্রহসনে সমাজজীবনের গভীর সমস্যার চিত্র তুলে ধরলেও এই সমস্যাকে ব্যঙ্গের কশাঘাতে বিদ্ধ করলেও তিনি কোথাও ব্যক্তিকে আক্রমণ করেন নি বা কোথাও তাঁর নৈতিক উদ্দেশ্যও প্রকাশিত হয়ে পড়েনি। বিশেষ করে এই প্রহসনে নাট্যকার যে সংলাপ ব্যবহার করেছেন তা তার সমকালীন সমাজ অভিজ্ঞতার রূপকেই প্রকটিত করে। সংলাপের ভাষাকে এত জীবন্ত রূপে প্রকাশ করেছেন যে, তাতে চরিত্রগুলিও বাস্তবরূপ পেয়েছে। যেমন, বাবাজী সারজেন্টকে চারটি টাকা দিয়ে মুক্তি পেল। ‘ওঙ্ক। কুচ কসুর নেই, ওন্দো ছোড় দেও’—টাকার বিনিময়ে সারজেন্টের কর্তব্য শেষ হল। বাবাজী বলেছে, ‘ভাগ্যে টাকা কটা সঙ্গে ছিল, আর সারজন বেটারও হাত পাতার রোগ আছে।’ পরের দৃশ্যে কালীর মুখে শুনতে পাই, ‘বৈয়গ্যব শালার ব্যবহার দেখে একেবারে অবাক হয়েছি। শালা এদিকে মালা ঠক ঠক করে, আবার ঘুষ খেয়ে মিথ্যে কথা কইতে স্বীকার পেলে? শালা কি হিপক্রেট!’ এ ধরনের সংলাপ প্রমাণ করে তিনি তাঁর জন্মভূমির মানুষ ও তাদের ভাষা সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞ ছিলেন।

‘একেই কি বলে সভ্যতা’র যেমন নব্য ইয়ংবেঙ্গলদের শ্রেণিচরিত্রকে উপস্থাপিত করেছেন, তেমনি ‘বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ’ প্রহসনটিতে প্রাচীন ধর্মধ্বজী রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের ধ্বজাধারীদের শ্রেণিরূপকে উপস্থাপিত করেছেন। প্রথম সংস্করণে এই প্রহসনের নাম ছিল ‘ভগ্ন শিবমন্দির’। মধুসূদনের এই প্রহসনটি পাইকপাড়ার রাজাদের অর্থব্যয়ে মুদ্রিত হয়। যেহেতু এই প্রহসনে ধর্মধ্বজী হিন্দুসমাজকে তীব্র বাদ্য করা হয়েছে তাই রাজারা এই প্রহসনকে মঞ্চস্থ করতে পারেন নি। সে যাই হোক, দুটি প্রহসন সমাজ ব্যবহার দুটি দিকের পরিচায়ক। একদিকে ইংরেজি শিক্ষিত, ঐতিহ্যবাহী নব্যযুবকরা তাদের অনাচারে ও অসংযত জীবনযাত্রায় সমাজের যেমন ক্ষতি করেছিল তেমনি একশ্রেণির সংকীর্ণমনা, সংরক্ষণশীল, ধর্মধ্বজী প্রাচীন সম্প্রদায় ও সমাজে অবক্ষয় সৃষ্টি করেছিল—যা দুটি প্রহসনে চিত্রিত হয়েছে।

‘বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ’তে ভক্তপ্রসাদের মাধ্যমে প্রবীণদের মহাজনি কারবার, অর্থলোলুপতা ও কুমারী কুল কামিনীদের সর্বনাশ সাধন প্রভৃতি চিত্রিত হয়েছে। যোগীন্দ্রনাথ বসু তাই লিখেছেন, “কেবল ইংরেজী শিক্ষিত, নব্যসম্প্রদায়েরই অনাচারে হিন্দু সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই; চরিত্রহীন বকধর্মী, প্রাচীন সম্প্রদায়ের কু-ব্যবহারে তদপেক্ষা শতগুণ অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। মধুসূদনের সময়ে এই শ্রেণীর কতকগুলি লোকের কলিকাতায় ও তাহার নিকটবর্তী পল্লীসমাজে বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। বাহিরে মালাজপ কিন্তু গোপনে বারাদনা প্রতিপালন তাঁহাদিগের অনেকের নিত্য ব্রত ছিল। বাহিরে হিন্দুধর্মানুমোদিত ক্রিয়াকর্মের অনুষ্ঠান করিলেও ইহাদিগের চরিত্র ও ব্যবহার হিন্দুশাস্ত্রসমূহকে উপহাসমাত্র করিত। ইয়ংবেঙ্গলদিগের উপর ইহাদিগের মর্মান্তিক বিদ্বেষ ছিল; কিন্তু ইয়ংবেঙ্গলগণ যে সকল পাপ কল্লনাও করিতে পারিতেন না, ইহারা তাহাতে লিপ্ত থাকিতে সংকুচিত হইতেন না। মধুসূদনের দ্বিতীয় প্রহসন ‘বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ’ এই শ্রেণীর লোকদিগকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত হইয়াছিল।” (মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত)

প্রহসনটি দুই অঙ্ক ও দুই গর্তাঙ্কে সম্পূর্ণ। এই প্রহসনে ভক্তপ্রসাদের চরিত্রের বাইর ও অন্তরের সামঞ্জস্যের অভাবকে উদঘাটিত করে ব্যঙ্গ করেছেন মধুসূদন। বাইরে সে ভক্ত, ঈশ্বরবিশ্বাসী ও হিন্দুর ঐতিহ্য রক্ষায় বদ্ধপরিকর কিন্তু অন্তরে সে অর্থলোলুপ ও ইন্দ্রিয়াসক্ত। মুসলমানের হাতে অন্ন গ্রহণে ভক্তপ্রসাদের ঘোর আপত্তি কিন্তু তাদের মেয়েকে ভোগ করার বেলায় তার মন অতি উদার। সেই সঙ্গে প্রজাশোষণ—তার অর্থনৈতিক উপার্জনের উৎস। ভক্তপ্রসাদ নব্য শিক্ষিতদের ক্রিয়াকলাপে ক্ষুব্ধ, ইংরেজি শিক্ষা যে সব অনর্থের মূল তাও তিনি মাঝে মাঝেই বলে থাকেন আবার ভগীর বিবাহিতা কন্যা পক্ষীকে পাওয়ার লালসায় তিনি উদ্গ্রীব। শেষ পর্যন্ত ভক্তপ্রসাদের পরিণতির মধ্যে নাট্যকারের নৈতিক অভিপ্রায় প্রকাশিত হয়েছে। উপসংহারে তাই দেখা যায়—

বাইরে ছিল সাধুর আকার,

মনটা কিন্তু ধর্ম-ধোয়া।

পুণ্য-খাতায় জমা শূন্য,

ভণ্ডামীতে চারটি পোয়া।।

শিক্ষা দিলে কিলের চোটে,

হাড় গুঁড়িয়ে খোয়ের মোয়া।।

যেমন কর্ম ফল্লো ধর্ম,

“বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া”।

ভক্তপ্রসাদের হিন্দুত্ব ও হিন্দুয়ানি নিতান্ত পণ্যবস্তু। নারীর রূপের বিনিময়ে সে অনায়াসে

তা ত্যাগ করতে পারে। তার ভোগাকাজ্জ্বল্যের সঙ্গে দীনবন্ধু নাম স্মরণ ও রাধাকৃষ্ণের নাম উচ্চারণ দুই বিপরীত কোটিকে অসম্প্রতভাবে যুক্ত করবার এক হাস্যকর প্রয়াস। এ তার ভণ্ডামীর পরিচায়ক। আবার ভক্তপ্রসাদের পরিবর্তন ও অনুশোচনা আকস্মিক বলে মনে হয়।

অন্যদিকে হানিফ গাজীর মতো সাধারণ কৃষকের বাস্তব সচেতনতা ও আত্মমর্যাদাবোধ অত্যন্ত প্রবল। পঞ্চানন বাচস্পতি দরিদ্র ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তি। তাঁর অসহায়তার সুযোগে ভক্তপ্রসাদ তাঁর ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি কেড়ে নিয়েছিল। আবার গদাধর ভক্তপ্রসাদের অনুগত কর্মচারী। সে তাঁর কুকর্মে সহায়তা করলেও তাঁর প্রতি আস্থা বা বিশ্বাস নেই। ফতেমা বুদ্ধিমতী ও সাহসিকা। ভক্তপ্রসাদের মুখোশ খুলে পড়লে ফতেমা অগ্রসর হয়ে কর্তাকে বলেছে, ‘নাড়োর মায়ে কি এখনে আর পছন্দ হ্যে না?’ ভক্তপ্রসাদ তাকে সব অনর্থের মূল বলে তিরস্কার করলে সে সহাস্যে উত্তর দিয়েছে, “সে কি কর্তাবাবু? —এই মুই আপনার কলজে হচ্ছেলাম, আরো কি কি হচ্ছেলাম; আবার এখন মোরে দূর কত্তি যাও?”

উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে বাংলায় যে পুরাতন সমাজব্যবস্থা ভেঙে পড়ছিল মধুসূদন তার বাস্তব চিত্র এঁকেছেন ‘বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ’তে। পল্লীসমাজের গভীর ক্ষতের উপস্থাপনে, মহাজনি শোষণের চিত্রণে, নব্যপন্থীদের সঙ্গে সনাতন রক্ষণশীলদের দ্বন্দ্ব এবং অর্থ, প্রভুত্ব ও ক্ষমতার বলে লাম্পাট প্রভৃতির বাস্তব চিত্র অঙ্কন করে মধুসূদন সমাজ সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। মুখ্য চরিত্রে ব্যক্তিলক্ষণ তীব্রভাবে প্রকাশ করে এবং বিচ্ছিন্ন সমাজচিত্রকে গল্পের মাধ্যমে পরিবেশন করে নাট্যকার প্রহসনটিকে নাট্যরস সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। প্রহসনটির মধ্যে আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিতের সমন্বয় ঘটেছে। যেমন ফতেমা তার স্বামীর জ্ঞাতসারেই পুঁটির কাছ থেকে টাকা নিয়েছে। কিন্তু এই ষড়যন্ত্র শেষ মুহূর্তের আগে প্রকাশিত হয়নি। আবার চরিত্রপযোগী সংলাপও প্রহসনটির শিল্পমূল্যকে বাড়িয়ে দিয়েছে। যেমন, প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে ভক্তপ্রসাদ ও গদাধরের কথোপকথন—

“ভক্ত। হাঁ! হাঁ! ছুঁড়ীটে দেখতে ছিল ভাল বটে, (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) রাধেকৃষ্ণ! প্রভো তুমিই সত্য। তা সে ইচ্ছের এখন কি হয়েছে রে?

গদা। আজ্ঞে, সে এখন বাজারে হয়ে পড়েছে। হানফের মাগ তার চাইতেও দেখতে ভাল।

ভক্ত। বলিস কি! অ্যাঁ? আজ রাতে ঠিকঠাক কতে পারবি তো?

গদা। আজ্ঞে, আজ না হয়, কাল পরশুর মধ্যে করে দেব।

ভক্ত। দেখ, টাকার ভয় করিস্ না। যত খরচ লাগে আমি দেব।

গদা। যে আজ্ঞে! (স্বগত) কত্তাটি এমনি খেপে উঠলেই তো আমরা বাঁচি, গো-মড়কেই মুচির পার্বর্ণ।”

মধুসূদন ‘মায়াকানন’ রচনা করেছিলেন ১৮৭৩ সালে ও তা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৭৪ সালে। মধুসূদন ‘মায়াকানন’ শেষ করে যেতে পারেন নি। পাঁচ অঙ্কে সমাপ্ত এই নাটকটিকে পৌরাণিক নাটক রূপে উপস্থাপিত করতে চেয়েছিলেন। একদিকে অলোকসামান্য রাজকুমারী ইন্দিরা ও অন্যদিকে অভিশাপগ্রস্ত দুই গন্ধর্ব নর-নারীর শাপমোচন কাহিনি এই নাটকের বিষয়বস্তু। নাটকের লৌকিক আবেদন অজয় ও ইন্দুমতীর পারস্পরিক গভীর প্রণয়কে কেন্দ্র করে উৎসারিত হয়েছে। ‘কৃষ্ণকুমারী’ নাটকের সঙ্গে মায়াকাননের সাদৃশ্য কোথাও কোথাও লক্ষ করা যায়। ‘মায়াকানন’-এর কাহিনি গ্রীক নাটকের মতো একমুখীন। তবে নাটকের মধ্যে কোন প্রত্যক্ষ সংঘাত দেখানো হয়নি। অজয় এই নাটকের নায়ক। নায়কোচিত দৃঢ়তা ও কর্তব্য

পালনের সংকল্প, পৌরুষের আত্মপ্রত্যয়ের অভাব লক্ষ্য করা যায়। রাজকুমারী ইন্দুমতীর চরিত্র কৃষ্ণকুমারীর আদলে রচিত হয়েছে। সুশীলতা, ধর্মপরতা, সংযম ও সারল্য চরিত্রটিকে বিশিষ্টতা দিয়েছে। এই নাটকে অভিজ্ঞান শকুন্তলের কিছু প্রভাব রয়েছে। শেষ বয়সে 'বিষ না ধনুর্গুণ' নামক একটি রূপক নাটক রচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন নাট্যকার, তবে তা তিনি সম্পূর্ণ করে যেতে পারেন নি।

☆ মধুসূদনের নাট্যপ্রতিভার বৈশিষ্ট্য :

এক) যথার্থ বাংলা নাটকের মুক্তি মধুসূদনের হাতে 'শর্মিষ্ঠা' প্রকাশের সঙ্গে।

দুই) মাইকেলের নাটকের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য ও গুণ হল তিনি নাটকের কাহিনিকে আদি থেকে অন্ত্য পর্যন্ত দৃঢ়সূত্রে আবদ্ধ করেছেন।

তিন) মধুসূদন প্রথম পাশ্চাত্য কলাদ্রিককে নাটকে অনুসরণ করেছেন। তবে তিনি যেমন সংস্কৃত নাটকের প্রভাব স্বীকার করেছেন তেমনই পাশ্চাত্য নাট্যাঙ্গিকেরও অনুসরণ করেছেন।

চার) মধুসূদন দুঃখ করে লিখেছিলেন,

অলীক কুনাট্য রঙ্গে মজে লোকে রাড়ে বঙ্গে
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।

রাড়-বঙ্গের অধিবাসীদের কুনাট্য প্রীতি দূর করে তিনি তাদের যথার্থ নাটকের স্বাদ দিতে পেরেছেন বলেই নাট্যসাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

পাঁচ) মধুসূদনের নাটকগুলি বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে জনপ্রিয়তার সঙ্গে অভিনীত হওয়ায় সেগুলির অভিনয় মূল্যও যথেষ্ট।

ছয়) মধুসূদন কাব্যজগতে যেমন ছিলেন বিদ্রোহী, অসম সাহসী, অসাধারণ প্রতিভাবান, তেমনই নাটকের ক্ষেত্রে তাঁর সেই প্রতিভার পরিচয় সাবলীল ও স্বতঃস্ফূর্ত।

সাত) বাংলা নাটকে প্রথম তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করেন।

আট) তাঁর নাটকের সংলাপ কোন কোন ক্ষেত্রে একঘেয়ে ও বৈচিত্র্যহীন হলেও প্রহসনে তিনি যে সংলাপ ব্যবহার করেছেন তার নাট্যোপযোগিতা অসাধারণ। তাঁর প্রহসন দুটিতে স্বল্পতম পরিসরের মধ্যে তাঁহার ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণতা ও অভ্রান্ত লক্ষ্য তাঁহার নিখুঁত সঙ্গতিবোধ ও নাটকীয় উদ্দেশ্যের একমুখিতাকে উজ্জ্বলভাবে পরিস্ফুট করিয়াছে।" (শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা, পৃঃ—৩৪)

নয়) মধুসূদনের নাট্যপ্রতিভার বৈশিষ্ট্য আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—“মধুসূদনের নাট্যরচনায় সংস্কৃত ও পাশ্চাত্য আদর্শের অনুকরণের চিহ্ন থাকিলেও, দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ফলে ঘনীভূত নাট্যরসে নাটকীয় রসপুষ্টির জন্য ঘটনাবিন্যাসে এবং চরিত্রসৃষ্টি ও মূল্যায়নে আধুনিক যুগের বাঙালীর প্রাণধর্ম ও জীবননিষ্ঠতার পরিচয় সুস্পষ্ট।” (বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা, পৃঃ—৩৪)

দশ) সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত নাট্যকার মধুসূদনের কৃতিত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন, “নাট্যসাহিত্যেও তাঁহার দান উপেক্ষণীয় নয়, তিনিই আধুনিক বাংলা নাটকের জনক এবং তাঁর পরে নাট্যসাহিত্য খুব বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই। শুধু সাহিত্যিক মানদণ্ড দিয়া বিচার করিলে বলা যাইতে পারে যে কৃষ্ণকুমারী বা বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ—এখনও বাংলা নাটকের ইতিহাসে উচ্চস্থান পাইবে।” (মধুসূদন কবি ও নাট্যকার—১৩৮০, পৃঃ—১১৮)।

এগার) মধুসূদন তাঁর নাটকে গ্রীক নাটকের ঐক্যবিধি অনুসরণ করেছেন। এজন্য তাঁর নাটকের কাহিনি দৃঢ়সংবদ্ধ ও গতিশীল।

২৯৬ ☆ নাটক

বার) মধুসূদনের নাটকের কথোপকথন একঘেয়ে এবং বৈচিত্র্যহীন। এর কারণ 'অনাবশ্যক ও আত্যন্তিক দীর্ঘতা'। এই দীর্ঘ কথোপকথন নাটকে রসসৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। তিনি যেহেতু একাধারে কবি ও নাট্যকার তাই নাটকের মধ্যে নিসর্গ বর্ণনা ও উপমা অলংকারের প্রয়োগ করে কবিত্ব ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন। তাই অজিতকুমার ঘোষ যথার্থই বলেছেন, "মধুসূদনের মানস কল্পনা সুগভীর দূরাস্থিত জগতে বিলাস করিতে চাহিত। সেজন্য তাঁহার কাব্য ও নাটকে প্রাত্যহিক জগতের পরিচিত ক্ষুদ্রতা নাই, অতীত জগতের বিচিত্র ইন্দ্রধনুচ্ছটায় তাহা রহস্যালোকিত।" (বাংলা নাটকের ইতিহাস—১৯৮৫, পৃঃ—৬৫)

মধুসূদনের প্রতিভা মূলত কবির হলেও নাট্যকার হিসেবেও তাঁর খ্যাতি ছিল যথেষ্ট। তিনি বিভিন্ন উপাদান থেকে তাঁর নাটকের নাট্যচরিত্রগুলিকে গ্রহণ করলেও চরিত্রগুলির মধ্যে মৌলিকতা সৃষ্টি করতে পেরেছেন। তাঁর নাটকে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতিকে দীকার করে নিলে নাট্যকার ও প্রহসনকার হিসেবে তাঁর লোকচরিত্র জ্ঞান ও জীবন রসরসিকতার যে পরিচয় পাওয়া যায় তা নিতান্ত তুচ্ছ নয়।

■ রামনারায়ণ তর্করত্ন (১৮২২ খ্রীঃ—১৮৮৬ খ্রীঃ) ■

যাত্রাপালা ও পাঁচালী গানের রুচি-বিকৃতি ঘটিয়ে জনমন তৃপ্তির জন্য নানামুখী নাট্যসম্ভারে নাট্যশালাকে সমৃদ্ধ করেছিলেন রামনারায়ণ তর্করত্ন। কখনও সংস্কৃত নাটক অনুবাদ করে, কখনও সমাজসমস্যামূলক নাটক লিখে অথবা প্রহসন রচনা করে এই ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত কলকাতা ও শহরতলী অঞ্চলে ‘নাটুকে বিজ্ঞাপন’ অনুযায়ী নাটক লিখে পুরস্কার-অর্জন করেছিলেন। রাজা-জমিদার-ধনী ব্যক্তিদের বরাত দেওয়া অভিজাত নাট্যমঞ্চ থেকে সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থের বাড়ি পর্যন্ত তাঁর নাটক অভিনীত হয়েছে। বিদ্যোৎসাহিনী-বেলগাছিয়া-জোড়াসাঁকো-পাথুরিয়াঘাটা—এই চারটি রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে তিনি যুক্ত হয়েছেন সংস্কৃত নাটক অনুবাদের বা মৌলিক নাটক রচনার সূত্রে। পুরস্কৃত নাটক লিখে তাঁর খ্যাতি অর্জনের সংবাদের কথা জানা যায়, যেমন বাংলাদেশের এক নাট্যোৎসাহী জমিদার কালীচন্দ্র চৌধুরী ‘সম্বাদভাস্কর’ ও ‘রঙ্গপুর বার্তাবহে’ বিজ্ঞাপন (৮ নভেম্বর, ১৮৫৩) দেন যে “সুললিত গৌড়ীয় ভাষায় ছয় মাসের মধ্যে ‘কুলীনকুলসর্বস্ব’ নামক একখানি মনোহর নাটক রচনা করিয়া রচকগণ মধ্যে সর্বোৎকৃষ্টতা দর্শাইতে পারিবেন তাঁহাকে সংকলিত ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা পারিতোষিক প্রদান করা যাইবেক” (উদ্ধৃত : পুলিন দাস : “বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ ও বাংলা নাটক”, পৃষ্ঠা ৩৪-৩৫)। রামনারায়ণ চার মাসের (১০. ৩. ১৯৫৪) মধ্যে নাটক লিখে সেই পুরস্কার অর্জন করেন। এর পূর্বেও তিনি পতিব্রতার উপাখ্যান রচনার জন্য এই রঙ্গপুরের জমিদারের কাছেই পুরস্কৃত হয়েছিলেন। আবার জোড়াসাঁকো থিয়েটারের সংযত মঞ্চ রুচি ও আদর্শের উপযোগী করে বহুবিবাহ বিরোধী নাটক লিখে তিনি একটি দামী শাল ও ৫০০ টাকা সাম্মানিক মূল্য লাভ করেন। এই সব পুরস্কৃত নাটকরচনা ও অভিনয়ের মাধ্যমে রামনারায়ণের নাট্যখ্যাতি বিস্তৃত হয়। বিভিন্ন মৌখিক রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুবাদে মঞ্চ-প্রকৃতি সম্পর্কে রামনারায়ণ অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। একথা সত্য, মাইকেল মধুসূদন দত্তের নাটক লেখার পূর্ব পর্যন্ত তিনি ছিলেন সব চাইতে মঞ্চসফল নাট্যকার। তাঁর অনূদিত নাটক ‘রত্নাবলী’র প্রতিক্রিয়ায় সাহেব মধুসূদন যে বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের উপযোগী নাটক লেখার কথা ভাবতে শুরু করেছিলেন, এ সত্য বিস্মৃত হবার নয়।

জন্ম ও কর্মজীবন : ১৭৪৫ শকাব্দে (১৮২২ খ্রীঃ ২৬ ডিসেম্বর) চব্বিশ পরগনার অন্তর্ভুক্ত হরিনাভি গ্রামে রামনারায়ণের জন্ম। পিতা, রামধন শিরোমণি। রামনারায়ণের প্রাথমিক শিক্ষা হয়েছিল চতুষ্পাঠীতে, পরে সংস্কৃত কলেজে। একসময়ে এখানে শিক্ষকতাও শুরু করেন। বাংলা রঙ্গমঞ্চ সম্পর্কে তাঁর সচেতনতা প্রথমাবধি ছিল না। তবে সামাজিক প্রথা সম্পর্কে তিনি যে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন তা বোঝা যায় ‘পতিব্রতোপাখ্যান’ নামে গদ্যরচনার মধ্যে। এই রচনার জন্য তিনি রঙ্গপুরের জমিদারের

কাছ থেকে পুরস্কার লাভ করেন। তারপরেই লেখেন কৌলীন্যপ্রথাকে কেন্দ্র করে নাটক। ব্যক্তিগত জীবনে অধ্যাপক তথা পুরুষানুক্রমে সংস্কৃত-নির্ভর রক্ষণশীল ধ্যান-ধারণার প্রতি অনুগত হয়েও রামনারায়ণ যেভাবে কৌলীন্যপ্রথার কুৎসিৎ পরিচয়টি উদ্ঘাটিত করেছেন তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। এই নাটক রচনায় তাঁর সামাজিক দায়িত্ববোধের প্রকাশ ঘটেছে। আবার রামনারায়ণের রচিত কিছু পৌরাণিক নাটক এবং প্রহসনও আছে। তাঁর সৃষ্ট নাটকগুলিকে সামাজিক, অনুবাদ-নাটক, পৌরাণিক এবং প্রহসন এই চারভাগে বিন্যস্ত করা যায় :

■ রচনাসমূহ ■

গদ্যরচনা : ‘পতিব্রতোপাখ্যান’ (১৮৫৩)।

নাটক রচনা : (ক) সামাজিক নাটক : ‘কুলীনকুলসর্বস্ব’ (১৮৫৪), ‘নবনাটক’ (১৮৬৫)।

(খ) অনুবাদ-নাটক : ‘বেণীসংহার’ (১৮৫৬), ‘মালতীমাধব’ (১৮৫৭), ‘রত্নাবলী’ (১৮৫৮), ‘অভিজ্ঞান শকুন্তলম্’ (১৮৬০)।

(গ) পৌরাণিক নাটক : ‘রুক্মিণীহরণ’ (১৮৭২), ‘কংস বধ’ (১৮৭৫), ‘ধর্মবিজয়’ (১৮৭৫)।

(ঘ) প্রহসন : ‘যেমন কর্ম তেমনি ফল’, মুস্তফি সাহেব-কা পাকা তামাসা’, ‘পরীস্থান’, ‘বাজার কুঘটন’, ‘চক্ষুদান’, ‘উভয়-সঙ্কট’।

রামনারায়ণের ‘কুলীনকুলসর্বস্ব’ (এ বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে টীকা-অংশে) নাটকটির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল কৌলীন্যপ্রথার কুফল প্রদর্শন। এই উদ্দেশ্যে নাটকটির কাহিনী ছয় ভাগে ছয় অঙ্কে বিন্যস্ত করা হয়। প্রথমে আছে কুলপালক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যাদের বিবাহ অনুষ্ঠান, দ্বিতীয় অংশে ঘটকের কপট ব্যবহার স্বরূপ উদ্ঘাটন নানা রহস্যজনক প্রস্তাব উত্থাপন, তৃতীয় অংশে কুলকামিনীগণের আচার-ব্যবহারের পরিচয়দান, চতুর্থ অংশে আছে শুক্রব্যবসায়ীর দোষোদ্ঘাটন, পঞ্চম অংশে নানা রহস্য ও বিরহী পঞ্চাননের বিয়োগ জ্ঞাপন, ষষ্ঠ অংশে আছে বিবাহ-নির্বাহ। এইসব ঘটনাসমূহের মাধ্যমে কুলের সম্মান রক্ষার জন্য কুলপালকের চার কন্যার জীবনবঞ্চনার তথা ব্যর্থতার রূঢ় বাস্তব চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এই নাটকটি প্রথমে (১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের মার্চের প্রথম সপ্তাহে) রামজয় বসাকের বাড়িতে অভিনীত হয়। প্রসিদ্ধ গায়ক রূপচাঁদ পক্ষী এ নাটকে গান সংযোজন করেছিলেন। এই নাটকটি পরে গদাধর শেঠের পারিবারিক মঞ্চে (১৮৫৮ খ্রীঃ) এবং চুঁচুড়ার নরোত্তম পালের অনুরূপ মঞ্চে (১৮৫৮ খ্রীঃ) অভিনীত হয়।

বহুবিবাহের দোষ দেখিয়ে পরবর্তী ‘নবনাটক’ লেখা হয়। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পরামর্শে গণেন্দ্রনাথ ও গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘জোড়াসাঁকো নাট্যশালা’র জন্য এই মর্মে বিজ্ঞাপন দেন : “বহু বিবাহের অনিষ্টকারিতা দেখাইয়া যিনি উৎকৃষ্ট নাটক লিখিতে পারিবেন, তাঁহাকে পাঁচশত টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে।” রামনারায়ণ তর্করত্ন অল্প দিনের মধ্যে ‘নবনাটক’ লিখে জোড়াসাঁকো থেকে এই পুরস্কার লাভ করেন।

এই নাটকের কাহিনীটি এইরকম : পরেশবাবু নামক জনৈক জমিদার স্ত্রী ও পুত্র থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয়বার প্রৌঢ় বয়সে বিবাহ করেন। তাঁর নববিবাহিতা স্ত্রীর মন্ত্রণায় প্রথম পক্ষের পত্নীর পুত্র সুবোধ দেশত্যাগী হয়ে মৃত্যুবরণ করে। প্রথমা পত্নী সাবিত্রী দুঃখে

আত্মহত্যা করেন। তারপর নবীনা স্ত্রীর প্রদত্ত বশীকরণ ঔষধ খেয়ে পরেশবাবু রোগগ্রস্ত হয়ে মারা যান। রামনারায়ণের আত্মকথার সাক্ষ্য জানা যায় এই নাটকটি জোড়াসাঁকো মঞ্চে উপর্যুপরি ন'বার অভিনীত হয়। প্রথম অভিনয় হয় ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দের ৫ই জানুয়ারী। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতিতে'ও এই নাটক অভিনয়ের উল্লেখ আছে।

“পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন লিখলেন বহুবিবাহ বিরোধী নাটক। একখানা দামী শাল ও পাঁচশো টাকা পুরস্কার পেলেন। নাটকের নাম হল নব নাটক” (অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রানী চন্দ, ‘ঘরোয়া’, ১৩৫৮, পৃষ্ঠা ৭৬)।

রামনারায়ণের রচিত অনুবাদ ও পৌরাণিক নাটকগুলি ছিল সংস্কৃত সাহিত্য ও পুরাণের প্রতিফলন বা পুনরাবৃত্তি। স্বভাবতই মৌলিকতার প্রকাশ এখানে ছিল নামমাত্র। তাঁর রচিত প্রহসনগুলির প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য ছিল সমাজশোধন। তবে এইগুলির অভিনয় বিবরণ ইতিহাস অস্পষ্ট। একথা সত্য, প্রথম পর্যায়ের নাট্যকাররূপে নাট্যকাহিনী বয়নে সংহতির অভাব, আঙ্গিক-শৈথিল্য, যাত্রাধর্মী বিবৃতিময় সংলাপ প্রভৃতি ত্রুটি রামনারায়ণের নাটকে দেখা যায়। তবু প্রথম সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে ‘সাহিত্যিক’ প্রতিবাদ প্রকাশে তাঁর মধ্যে সংস্কারমুক্ত সমাজসচেতন মনোভাবের পরিচয় পাওয়া গেছে। আর এই কারণে বাংলা নাটকে তিনি আজও স্মরণীয় ব্যক্তি।

■ নাট্যকার মধুসূদন দত্ত (১৮২৪ খ্রীঃ—১৮৭৩ খ্রীঃ) ■

"In the great European Drama you the stern realities of life, lofty passion and heroism of sentiments. With us it is all softness, all romances. We forget the world of reality and dream of Fairy lands. Ours are dramatic poems ;....." (কেশব গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত, Letter No. 66, মধুসূদন রচনাবলী ; পৃ. ৩১৭)।

বন্ধুর কাছে লেখা মধুসূদনের এই পত্রে পাশ্চাত্য নাট্যসাহিত্যের কঠোর বাস্তবতা, উচ্চ হৃদয়বেগ শৈর্য প্রকাশের অসামান্য উৎকর্ষ এবং স্বদেশীয় নাট্যসাহিত্যের কোমল ভাব, দৈন্য, সম্বন্ধে শ্রদ্ধা ও বেদনার এই দ্বৈত মনোভাব অনুভব করা যায়। বাংলা নাটকের দুর্বল খাতে তিনি আনতে চেয়েছিলেন সাগরপারের লবণাক্ত প্লাবন, বীরোচিত গাভীর্য এবং মানুষের বাস্তব জীবন অবাস্তবতার সংঘাতের দ্বন্দ্বিক রূপায়ণ। তিনি ভাবের স্বদেশীয়ত্ব রক্ষা করে, সেইসঙ্গে পাশ্চাত্য নাটকের উপাদান সংগ্রহ করে নাটক লিখতে চেয়েছিলেন —"I may borrow a necktie but not the whole suit." এই আত্মবিশ্বাসই তাঁর নাটকে স্বাতন্ত্র্য এনেছে।

■ নাট্যগ্রন্থসমূহ ■

(ক) পৌরাণিক নাটক : ‘শর্মিষ্ঠা’ (১৮৫৯), ‘পদ্মাবতী’ (১৮৬০)।

(খ) ঐতিহাসিক নাটক : ‘কৃষ্ণকুমারী’ (১৮৬১)।

(গ) রূপক নাটক : ‘মায়াকানন’ (১৮৭৪), ‘বিষ না ধনুর্গণ’ (অসমাপ্ত)।

(ঘ) প্রহসন : ‘একেই কি বলে সভ্যতা’, ‘বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রৌ’ (১৮৬০)।

১৮৫৮ সালে বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনীত রামনারায়ণ তর্করত্নের ‘কুলীনকুল সর্বস্ব’ নাটককে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সবাসাচী মধুসূদনের ‘শর্মিষ্ঠা’ বাঙালী পাঠকের মনোলোকে পেল প্রবেশের ছাড়পত্র। এতদিন বাংলা নাটক ছিল ভারতচন্দ্রের যাযাবরী

উদ্দামতা আর মধ্যযুগীয় সাহিত্যের পরিবেশ-শাসিত রুচিনিষ্ঠার ফসল। তা দেখে সত্যসন্ধ কবির আক্ষেপোক্তি :

“অলীক কুনাট্য-রঙ্গে মজে লোকে রাঢ় বঙ্গে
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।”

আর এর ফলেই মহাভারতীয় যযাতি-শর্মিষ্ঠা-দেবযানীর-কাহিনীর রূপ ও রেখায় নতুনভাবে জন্ম নিল মধুসূদনের মানস-সরোবরে। কালিদাসের ‘অভিজ্ঞান শকুন্তলম্’-এর অপরিচিত আবির্ভাব এখানে যেমন বিদ্যমান তেমনি শেক্সপীয়ারের নাট্যাদর্শও এখানে লক্ষণীয়। নিয়তি-লাঞ্ছিত ‘শর্মিষ্ঠা’র চরিত্র নাটকের মধ্যে অনস্বর রেখায় উজ্জ্বল। বাংলা নাট্যসন্ধির মুহূর্তে নবসৃষ্টির মাস্টলিক গাওয়ার জন্য নাটকটি তৎকালে বিপুলভাবে অভিনন্দিত হয়েছিল। মধুসূদনের এ সম্বন্ধে অভিমত : “I am of opinion that Sarmistha is the best drama we have in our language that it is at once classical, chaste and full of genuine poetry.” কিন্তু গ্রন্থটিতে মধুসূদনের শিক্ষানবিশীর পরিচয় পরিস্ফুট বলে এর ক্রটিগুলি অনুপেক্ষণীয় : (১) কাহিনীগত ক্রটি হল সমস্ত ঘটনার দৃশ্যময় উপস্থাপনা বিরলদৃষ্ট। অনেক ঘটনা বাস্তবে না ঘটে যেন কবির মনোজগতে সংঘটিত হয়েছে। যেমন—শর্মিষ্ঠা-দেবযানীর বিবাদ নাট্যমধ্যে উল্লেখ থাকলেও বাস্তবে তার অভিনয়োপযোগী দৃশ্যরূপ অনুপস্থিত। (২) সংলাপজনিত ক্রটি : সংস্কৃতানুগ সালঙ্করা সংলাপ প্রয়োগের ফলে এই নাটকের স্বাভাবিকতা রক্ষিত হয়নি।

‘শর্মিষ্ঠার’ সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে মধুসূদনের ‘পদ্মাবতী’ নাটকের সূত্রপাত। গ্রীসদেশের ‘Apple of Discord’ পুরাকাহিনী থেকে কাহিনী-অংশ নির্বাচিত। গ্রীক নাটকের জুনো-ভেনাস-প্যালাস-প্যারিস ও হেলেন যথাক্রমে শচী-রতি-মুরজা-ইন্দ্রনীল ও পদ্মাবতী চরিত্রে রূপায়িত হয়েছে। ‘ডিসকর্ডিয়া’ নারদ চরিত্রে রূপান্তরিত। সৃজনীশক্তির গুণে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য নাট্যশিল্প হয়েছে একই পথের অভিসারী। শিল্পসুলভ সংলাপ রচনায় ও প্রণয়তত্ত্বের অপূর্ব বর্ণনা-নৈপুণ্যে নাটকটি কমেডিতে শেষ পর্যন্ত পরিণত। ‘শর্মিষ্ঠার’ সংলাপ-জড়তা এখানে নেই। এই নাটকটি রচনা করতে গিয়ে মধুসূদন উপলব্ধি করেন “No real improvement in the Bengali Drama could be expected until Blank verse was introduced into it.” তাই অমিত্র-হৃন্দের উল্লেহ গর্জনের ক্ষীণভাস এ নাটকের মধ্যে আছে। এখান থেকেই অমিত্রাক্ষরের বিচিত্রমুখিনতার যাত্রারম্ভ। ছন্দবৈশিষ্ট্য ও স্বাভাবিক সংলাপে নাটকটি প্রাণবন্ত। কিন্তু এর মধ্যে একটি ক্রটি লক্ষণীয়। তা হলো, মানব চরিত্রগুলি এখানে যেন স্বাধিকার হারিয়ে ফেলে দেব-দেবীর হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছে।

এরপর মধুসূদনের শেষ পূর্ণাঙ্গ নাটক ও বাংলা সাহিত্যে প্রথম ট্রাজেডি ‘কৃষ্ণকুমারী’ রচিত হয়। এটি নাট্যকার মধুসূদন-প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞান। টডের ‘Anals of Rajasthan’-এর আখ্যায়িকা থেকে কাহিনীর উপকরণ সংগৃহীত হয়েছে। পুরাণের কল্পিত কাহিনী থেকে ইতিহাসের ধূসর জগতে এই তাঁর প্রথম পদক্ষেপ।

ইতিহাসকার ও নাট্যকারের মধ্যে পার্থক্য : ইতিহাসকার আর নাট্যকারের মধ্যে একটি দূরবেধী পার্থক্য দৃশ্যমান। ঐতিহাসিকের ধ্রুব লক্ষ্য, নিজের ব্যক্তিপুরুষকে নিজের ভাব-বেদনাকে তাঁর সত্যান্বেষণ থেকে নিশ্চিহ্ন করা। তিনি এমন এক ঐতিহাসিক সত্যের সন্ধানী যা বিষয়ধর্মী, কিন্তু বিষয়ের অনুভব-সাপেক্ষিক নয়, অভিজ্ঞেয় কিন্তু অভিজ্ঞতা-বিনির্ভর। পক্ষান্তরে, নাট্যশিল্পী তথা সাহিত্যিক ইতিহাসের নীরস তথ্যের

রূপ-রিক্ত ভাবনাকে কালি-কলমের চিত্রাঙ্কনায় চিরন্তন করতে প্রয়াসী। ইতিহাসের মৃত 'ফসিলে'র মধ্যেও তিনি মানব-মানবীর 'এক বিন্দু নয়নের জল' আবিষ্কারে ব্রতী হন। তাঁর জগৎ আনন্দ-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষার স্পর্শে স্পন্দিত হয়; অন্তর্লোক ও বিশ্বলোক তাঁর মধ্যে একাত্ম হয়ে ওঠে। তাই ইতিহাসের দ্বারা সংযম-শাসিত হয়েও তিনি অনেক ক্ষেত্রে 'আপন মনের মাধুরী মিশায়' চরিত্র ও ঘটনার যোজন-বর্জনে নিযুক্ত হন। ভাষার ঈশ্বরিত্ব ও প্রসাদগুণে ইতিহাস তখন নান্দনিক গুণে স্বাক্ষর হয়। কালি-কলমের চিত্রাঙ্কনায় মণ্ডিত সেই ইতিহাসের জগৎ তখন শিল্পসত্যে রূপান্তরিত হয়। জাতপ্রাজ্ঞ মধুসূদনের কল্পনায় ইতিহাস বিকৃত হয়নি।

মধুসূদনের উদ্যোগে উল্লিখিত টডের গ্রন্থটির মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে কল্পনামূলক ইতিহাসের 'ইন্দ্রপ্রস্থ' রচনার কাজ সূচনা হয়। মধুসূদন থেকে এই ঐতিহাসিক শিল্প-বোধের সূচনা হয়। পরবর্তী পর্যায়ে বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রমুখ প্রতিভার পরিচর্যায় 'নানামুখী ভাবনায়' তার বিকাশ ঘটে। এঁরা প্রায় প্রত্যেকেই টডের কিংবদন্তীমূলক কাহিনীর প্রতি আকৃষ্ট হন। টডের মাধ্যমেই তাঁদের ঐতিহাসিকবোধের সাহিত্যিক প্রকাশ ঘটে। প্রসঙ্গক্রমে স্মরণীয়, পাশ্চাত্যে আধুনিক নাট্যকারদের মধ্যেও অনেকে গ্রীসীয় উপকথার স্বর্ণখনি থেকে উপকরণ নিয়েই সমৃদ্ধ নাটক রচনার চেষ্টা করেছেন—ও নীল ('Mourning Becomes Electra'), এলিয়ট ('The Family Reunion'), ককত ('The Infernal Machine'), সার্ত্র ('The Flies'), রবিনসন জেফার্স ('Medea') হফমানস্টল ('Elektra'), জিদ্ ('Ajex'), ক্লডেনৎ, ইয়েটস্, এজরা পাউন্ড প্রভৃতি। অবশ্য আধুনিক চিন্তা প্রকাশের প্রয়োজনে এঁদের ফ্রেয়েড, ফ্রেজারের কাছেও যেতে হয়েছে।

কৃষ্ণকুমারীতে টডের উপাদান : টডের গ্রন্থে মুগ্ধ মধুসূদন কেশব গাঙ্গুলীকে লিখেছিলেন—"For two nights, I set up for hours pouring over the tremendous pages of Tod and about 1 A. M. last Saturday, the Muses smiled !" 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের সূত্র অনুসন্ধানের এই দুঃস্বাপ্য-মুহূর্তটুকুর বর্ণনাদানের পরেই নাট্যকারের স্বচ্ছ স্বীকারোক্তি : "I have made the list of Dramatist personage as short as I could, for I wish to leave no loophole for our manager to escape through" বোঝা যায়, সূতীক্ষ্ণ চিন্তার ছকে সমস্ত নাটকটির কাহানির্মাণ করা হয়েছিল। তারপরই লক্ষ্য করি প্রতিভার প্রাচুর্য সত্ত্বেও তাঁর মধ্যে দ্বন্দ্বের প্রকাশ, Historic Tragedy-র মধ্যে স্ত্রী-চরিত্র প্রয়োজনে নয়, ছোটো রাজার ইচ্ছানুযায়ী তার আয়োজন করা হয়েছিল—"If the Chota Raja should grumble about the Females, please tell him I undertake to find 3 out of the 4 !"

নাটকের মূল কাহিনী, উদয়পুর রাজপরিবারের ঘটনা টডের ধারানুযায়ী রচিত হয়। মেবারের অসহায় অবস্থা, দেশরক্ষার জন্য রাণার কৃষ্ণাকে হত্যার আদেশ এবং আত্মবলিদানের মাধ্যমে কৃষ্ণার মৃত্যুর ঘটনা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। তবে কৃষ্ণার মৃত্যু-বর্ণনায় নাট্যকার স্বকীয়তার পরিচয় দিয়েছেন। খড়্গাঘাতে কৃষ্ণার মৃত্যু চমকপ্রদ এবং এর মধ্য দিয়ে কৃষ্ণার আত্মোৎসর্গের গৌরব এবং বেদনার বাণী উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কিন্তু 'রাজস্থানে' আছে কৃষ্ণা আত্মহত্যা করেনি, তাকে হত্যা করা হয়েছে—একবার নয়, তিনবার। তিন রকম বিষের ক্রিয়া ব্যর্থ হওয়ার পর, চতুর্থবার মারাত্মক বিষের প্রয়োগ ক্রিয়ায় তার মৃত্যু ঘটে। টডের সংবেদী ভাষায় : 'She received it with a smile.'

wished the scene over, and drank it. The desires of barbarity were accomplished, She slept, a sleep from which she never awoke."—Rajasthan (1914) Vol.I.P. 369. কৃষ্ণর শোকে তার মাতার মৃত্যুর ঘটনা ইতিহাসে বর্ণনা করা হয়েছে। নাটকেও অহল্যা দেবীর “জন্মের মতন বিদায় নেবার কথা” উল্লেখ করা হয়েছে। অবশ্য কেশব গাঙ্গুলীকে লেখা চিঠি থেকে জানা যায় “the poor queen also dies—but behind the scenes.” কৃষ্ণকুমারী কাহিনীতে একমাত্র চমকপ্রদ মৃত্যু ছাড়া নাটকীয় উপাদান বিরল। সম্ভবত সেই কারণে মধুসূদন লিখেছিলেন : “The story of Krishna, though tragic, is barren of incidents”. কৃষ্ণর রোমান্টিক নায়িকারূপ, মানসিংহের প্রতি তার অনুরাগ, সঙ্গীতে আসক্তি, উদ্যান-প্রীতি নাট্যকারের কবি-কল্পনার সোনালী ফসল।

‘কৃষ্ণকুমারী’ নাটকে, ভীমসিংহ, কৃষ্ণকুমারী, অহল্যা দেবী, জগৎসিংহ ঐতিহাসিক চরিত্র। কৃষ্ণকুমারী এখানে সমস্ত সদৃশাবলীর আকর। চাঁদেও কলঙ্ক অনায়াসলভ্য, সূর্যমণ্ডলীতেও ক্ষত, কিন্তু কৃষ্ণ শুভ্র নিরঞ্জন, ভীমসিংহের সাজানো বাগানের সবচেয়ে সুন্দর, পবিত্র ও মালিন্যমুক্ত পুষ্প। জগৎসিংহ কিছুটা লঘুচপল। বলেন্দ্র সিংহ আপাতচপল, কিন্তু শেষাংশে তাঁর নিরুপায় অবস্থা আশ্চর্য সক্রিয়, স্নেহ ও কর্তব্যের যুগ্ম দ্বন্দ্বে ক্ষত বিক্ষত। এখানে তিনি যেন অভিশপ্ত। কৃষ্ণ-জননী অহল্যা প্রথম থেকেই বিষণ্ণ বেদনায় নিম্গত। কাহিনীর শেষে তাঁর “মহারাজ, তুমি ও হাত দিয়ে আমাকে ছুঁও না, তোমার হাতে আমার কৃষ্ণর রক্ত লেগে আছে” উক্তি, জীবনের গভীরতম সত্যে মর্মস্পর্শী। আপন সাম্রাজ্যের ভগ্নস্থূপের উপর দণ্ডায়মান ভীমসিংহের স্বজনহীন রাজপুরীর দিকে তাকিয়ে ‘হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ!’ বলে বজ্র-হৃদয়ের যে অতলস্পর্শী রিক্ততা, তা যেন অনাবৃষ্টির দন্ধ প্রান্তরের রৌদ্রজ্বালাময় আকাশের দিকে তাকিয়ে কোনো এক নিষ্পত্র বনস্পতির ভগ্নহৃদয়ের অন্তহীন হাহাকার!

কৃষ্ণকুমারীতে সংস্কৃত নাটকের উপাদান : নাটকের উপকাহিনী জয়পুরের ঘটনা। বিলাসবতী, মদনিকা, ধনদাস এবং উদয়পুরের তপস্বিনীর কায়ানির্মাণে ইতিহাস নয়, নাট্যকারের কল্পনার ছয়াই অবলম্বন। অবশ্য শূদ্রকের ‘মুচ্ছকটিক’ নাটকের বসন্তসেনা, মদনিকা ও শকারের অলঙ্কার প্রভাব সম্ভবত পড়েছে। বিলাসবতী বসন্তসেনার মত বারবিলাসিনী নারী, তবু সে অকৃত্রিম প্রণয়ে অচঞ্চলা ও প্রিয়তমের কল্যাণ কামনায় নিয়োজিত। চরিত্রটি প্রাণের সতেজ উজ্জ্বলতায় পরিপূর্ণ। বিলাসবতীর নাটকে আগমন কাহিনীতে জটিলতা সৃষ্টির প্রয়োজন ঘটেছে। মদনিকার চক্রান্তের অন্তরালেও তারই স্বার্থ-সংসক্তি স্মরণীয়। বিলাসবতী চরিত্রটিও শুধুমাত্র নাট্যকারের কল্পনার স্বয়ংসিদ্ধ সৃষ্টি নয়, “This জগৎসিংহ of জয়পুর had a favourite mistress. Tod gives her name as the ‘Essence of Camphor’, I think we may bring her in and allow her jealousy full play...” এ নাটকে তপস্বিনীরও অস্তিত্ব অপয়োজনীয় নয়। উদয়পুরের দুর্ভাগ্যের দিনে রাজপরিবারের মনে সান্ত্বনার বাণী সিঞ্চে তাঁর ভূমিকা মোটামুটি সার্থক হয়ে উঠেছে। ধনদাসও সর্বক্ষেত্রে শকারের অনুকৃতি নয়।

‘কৃষ্ণকুমারী’ নাটকে যে চরিত্রচিত্রণ তৎকালীন এবং উত্তরকালিক বিচারে মধুসূদনের একটি অন্যতম ত্রুটি বলে সমালোচকেরা মনে করেন, তা হল বিলাসবতী-সখী মদনিকা। রাজকুমারী কৃষ্ণর জীবনে সুখ-শান্তি অপসারণের কাজে তার দায়িত্ব ছিল অনেকখানি। জগৎসিংহ ও বিলাসবতীর প্রণয়-কাহিনী, কৃষ্ণকে জগৎসিংহের বিবাহের ইচ্ছা দেখে

বিলাসবতীর ঈর্ষা, মদনিকা ও ধনদাসের প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রভৃতি প্রসঙ্গ নাট্যকারের মৌলিক কল্পনায় উদ্ভাবিত। ঘটনাগুলি নাটকের মধ্যে জটিলতা আনয়নে সহায়ক হয়েছে। মদনিকার কৃষ্ণকুমারী ও মানসিংহের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য যেন সেতুসম্ভব অবস্থান ঘটেছে। দুজনের মধ্যে আছে অপরিচয়ের দূরত্ব। তবু পরস্পরের মনের মধ্যে প্রেমের ভাব জাগাবার জন্য মদনিকার সক্রিয়তা সমালোচকের দৃষ্টিতে অনৈতিহাসিক, অবিশ্বাস্য এবং আপত্তিকর বলে মনে হয়েছে। অবশ্য স্বয়ং স্রষ্টার কাছে 'Madanika is my favourite'। সম্ভবত, এখানে তিনি সংযুক্তাকে লাভ করার জন্য পৃথ্বরাজের নিযুক্ত ধাত্রী এবং বাণভট্টের 'কাদম্বরী' গদ্যকাব্যে পত্রলেখার স্মরণে চরিত্রটি অঙ্কন করেছেন। নিরপেক্ষ বিচারে, নাটকের গতি-নিয়ন্ত্রণে মদনিকার ভূমিকাকে অস্বীকার করা যায় না। চরিত্রটিও প্রাণপ্রাচুর্যে উজ্জ্বল, জীবনরসে উদ্দীপ্ত, বুদ্ধিমত্তায় সজ্জিত।

নাট্যকার কাহিনীর মধ্যে মহারাষ্ট্রপতি, মানসিংহ ও আমির খাঁর বৃত্তান্ত এনে ভারাক্রান্ত করেন নি। ইতিহাসের উপাদান নির্বাচনে এবং তার নাটকীয় সদ্যবহারে তাঁর নাট্যশিক্ষাজ্ঞানের নিষ্ঠা ও মনন প্রকাশমান। ঐতিহাসিক পটভূমির উপস্থাপনে এবং ইতিহাসের তথ্য-নুড়ির মধ্য দিয়ে রসগঙ্গার ধ্রুবপদী জলতরঙ্গ সুর শোনানোর নৈপুণ্যে নাটকটি সার্থক ঐতিহাসিক নাটকরূপে বিবেচ্য।

'কৃষ্ণকুমারী'র পর মধুসূদনের 'মায়াকানন' প্রকাশিত হয়। নাটকটি যেন কবি-চিন্তের বেদনার্লাস্ত মনের প্রকাশ। অতীতের রূপকথাশ্রিত স্বপ্নাভিসারে যাত্রা করেছে কবি-মন। নাটকটির আদি-মধ্য ও অভ্যন্তরে বহে চলেছে শুধু বিষাদের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ। মানুষের অকৃত্রিম প্রণয়ের উপর দৈবশক্তির অকারণ অভিসম্পাত বর্ষিত হয়েছে।

প্রহসন : 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' : যুগন্ধর মধুসূদনের প্রতিভা শুধু মহাসমুদ্রের উদাত্ত মহাসঙ্গীতেই পরিপূর্ণ ছিল না, তা নির্ঝরিনীর হাস্যমধুর কলগীতিও সৃষ্টি করেছিল। বীররস প্রকাশের ক্ষেত্রে তিনি অগ্রজ মহানায়ক, আবার নির্মল হাস্যরসের ধারা সৃষ্টিতে তিনি নব-ভগীরথ। অশুদ্ধ ভাঁড়মীর উদামতা, 'সুধারস অনাদরে' তনুমন ক্ষয়কারী হলাহল পানে রুচিহীনতার বিষব্রণ বাংলার সাহিত্য-শরীরে যখন প্রকট, তখন 'অলীক কুনাট্য রঙ্গে' শোনা গেল তাঁর কণ্ঠে নির্মল শুভ্র সংযত রসিকতার অতুলন নান্দীপাঠ। 'একেই কি বলে সভ্যতা' আর 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ', প্রহসন দুটি নিয়ে আবির্ভূত হলেন প্রথম সার্থক প্রহসন স্রষ্টা এবং প্রথম শোভন রুচির নাট্যকার। মধুসূদনের প্রহসন দুটি বাস্তবতাবোধ, সমাজ-সমালোচনা আর কৌতুকরস সৃষ্টির এক অতুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। শুধু মধুকরী কল্পনার বর্ণোজ্জ্বল আকাশ-বিহার নয়, ধূলিমলিন বাস্তব জগতের কঠিন মৃত্তিকাতেও ছিল তাঁর স্বচ্ছন্দ পদসঞ্চারণ। আকাশ এবং মাটির মধ্যে তিনি যেন এক সেতুবন্ধী সওদাগর।

ল্যাটিন 'Farcio' থেকে উদ্ভূত ইংরেজী 'Farce' শব্দটির প্রতিশব্দ 'প্রহসন', যার মৌল লক্ষ্য হল, হাস্যরসাত্মক জীবনালেখ্য সৃষ্টি—'The type of drama stuffed with low humour and extravagant wit'; সমকালীন ঘটনা বা কোনো প্রচলিত মতবাদের উপর প্রহসন রচনার দৃষ্টান্ত ভারতীয় সাহিত্যে অবিরল। নাট্য-শাস্ত্রকারের নির্দেশানুসারে সেখানে ভাষাকে স্বাভাবিক রাখা ও সমাজের নিম্নস্তরের লোকদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করা প্রায় অপরিহার্য ছিল। মধুসূদন প্রহসন রচনায় ভারতীয় ধারাই অনুসরণ করেছেন। অবশ্য 'La Comedy of Farce' জাতীয় বিদেশী প্রহসন থেকে উপাদান সংগ্রহ করা হয়ত এই

মধুকরব্রতী শিল্পীর পক্ষে অসম্ভব ছিল না। তবে মুখ্যত নাট্যকার এখানে ভারতীয় নাট্যশাস্ত্র দ্বারা উদ্বোধিত হয়েছেন।

প্রহসনের ভাষা : ‘একেই কি বলে সভ্যতা’ সমসাময়িক নব্যবঙ্গের এক নিখুঁত আলেখ্য। ইয়ংবেঙ্গলের কালাপাহাড়ী মনোভাব, অনুকরণ-প্রিয়তা, মদ্যাসক্তি আর উচ্ছৃঙ্খল তারুণ্য এই প্রহসনে আশ্চর্য দক্ষতায় উদ্ঘাটিত হয়েছে। চরিত্রগুলি শুধু অঙ্কন নয়, একেবারে যেন বাস্তব সমাজ থেকে আহরিত। তাই এদের চরিত্র, সংলাপ ও বেশভূষা আমাদের অত্যন্ত সুপরিচিত। মদ্যপানরত কালীমাথের সংলাপ : “রোসো ভাই আরো একটুখানি খেয়ে নি। দেখো যে গুড্ জেনারেল হয়, সে কি সুযোগ পেলে তার গ্যারিসনে প্রোবিজন জমাতে কসুর করে”, নবকুমারের প্রাণোচ্ছল ভাষণ : “জেন্টেলমেন ইন দি নেম অফ ক্রীডস, লেট আস এনজয় আওয়ারসেলভস্”, কিংবা বাবাজীর আধুনিক মনোবৃত্তির পরিচয় : “রাধে কৃষ্ণ! আ! বাঁচলেম; আজ কি কুলগেই বাড়ী থেকে বের হয়েছিলেম” এই চরিত্রগুলি কল্পনার ফসল নয়, মধুসূদনের তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণশক্তি ও অভ্রান্ত লোকচরিত্রজ্ঞানের পরিচায়ক। নাটকের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে নাট্যকার শান্তশীল বাঙালীর অন্তঃপুরে প্রবেশ করে তৎকালীন বঙ্গললনাদের যেন তুলে এনে আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন। তাদের অবসর সময়ে তাসখেলার অলস আমোদ-বিলাসের চিত্র : “আমি ভাই বিবি দিলাম”, “মর, ও যে আমাদের পিট, তুই বিবি দিলি কেন”, সেকেলে রঙ্গ-রসিকতা : “সেদিন বাবু জ্ঞানতরঙ্গিনী সভা থেকে ফিরে এসে ঠাকুরঝিকে দেখেই অমনি ধরে ওর গালে একটি চুমো খেলেন”, পারস্পরিক স্নেহপ্রীতি-সিক্ত কথাবার্তা : “ও ঠাকুরজি, আজ দেখ তোর ভারী আহ্লাদের দিন। দেখ হয়ত তোর দাদা আজ আবার এসে তোকে নিয়ে সেরকম রঙ্গ বাধায়”—অনবদ্য শিল্প-দক্ষতায় প্রস্ফুটিত। মেয়েলী হাস্যপরিহাস এবং তাদের কথাবলার ভঙ্গী এবং বৈশিষ্ট্য নাট্যকার আশ্চর্য সাবলীলতায় পরিবেশন করেছেন। প্রচলিত বাগ্‌ভঙ্গি এবং বাংলা প্রবাদ সংলাপে স্থান পাওয়ায় কোনো কোনো চরিত্র স্বল্প সময়েই মন কেড়ে নেয়। এ প্রসঙ্গে বারবিলাসিনীদের কথাবার্তা স্মরণ করা যায় : “ওলো বামা, গুরো পোড়ামুখোর আক্কেল দেখলি”, “তোর যেমন পোড়া কপাল, তাই ও হতভাগাকে রেখেচিস। আমি হলে এতদিনে কুলোর বাতাস দিয়ে বিদেয় করতুম”, “আজ মুড়ো খ্যাংরা দে বিষ ঝাড়ব”, “মিনসের রকম দেখ না, যেন তুলসী বনের বাঘ।” এসব চরিত্র শতাব্দীর দ্রুতগতি আর শাসন উপেক্ষা করে আজো স্বমহিমায় আসীন। সমাজ-সমস্যা এই নাটকে আছে। কিন্তু তার বাড়াবাড়ি নেই। শাণিত ব্যঙ্গ আছে, কিন্তু তাকে ছাপিয়ে উঠেছে অনর্গল হাসির অফুরন্ত প্রবাহ। বঙ্কিমচন্দ্র তাই প্রহসনটিকে রাজসিক অভিনন্দন জানিয়ে বলেছিলেন : “Is this Civilization? Is the best (farce) in our language.” রামগতি ন্যায়রত্ন বলেছিলেন : “আমাদিগের বিবেচনায় এরূপ প্রকৃতির যতগুলি পুস্তক রচিত হইয়াছে তন্মধ্যে এইখানি সর্বোৎকৃষ্ট।”

মধুসূদনের দ্বিতীয় প্রহসন ‘বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রৌ’ তার অসামান্য প্রতিভার আর এক স্বাক্ষর। এখানেও নাট্যকার মৃত্তিকাকারী। স্থূল-বিরস-বিসদৃশ গ্রামজীবনের মর্মলোকে অবগাহন করে বীক্ষণ-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। নগর জীবনের বিদগ্ধ এবং বিলাসী জীবন-ত্যাগী ‘সাহেব মধুসূদন’ এখানে নেমে এসেছেন গ্রামজীবনের পঙ্ককুণ্ডে, আর সেখান থেকেই যেন মুখের ভাষা সমেত তুলে এনেছেন হানিফ আর ফতেমাকে, গদাধর, ভক্তপ্রসাদ আর পুঁটিকে। প্রথম প্রহসনে তিনি চরিত্রের অসঙ্গতি দেখিয়ে মৃদু শ্লেষমিশ্রিত

পরিহাসের উপভোগ্য রসসৃষ্টিতে তৎপর ছিলেন, আর দ্বিতীয় প্রহসনে তিনি চরিত্রের অপরাধ উদ্ঘাটন করে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের চাবুক নিয়ে যেন অবতীর্ণ হয়েছেন। প্রথম প্রহসনে ইয়ংবেঙ্গলী সমাজের প্রতি তাঁর মনোভাব অনেকখানি প্রশয়-শিথিল, কিন্তু দ্বিতীয় প্রহসনে প্রাচীনপন্থী, হিন্দুধর্ম-ধ্বজাধারী ও ইন্দিয়াসক্ত সমাজের প্রতি তাঁর ক্রোধ বহির্দীপ্তিতে প্রকাশিত এখানেও হাস্যরস প্রবহমান, কিন্তু ব্যঙ্গোক্তি প্রধানতম। মিনাওয়ার রচিত নব গ্রীক কমেডি এবং পরবর্তীকালে বেন জনসন ও মলিয়ারের কমেডিতে যে জটিল যড়যন্ত্রমূলক বৃত্তগঠনরীতি লভ্য, তার সঙ্গে ‘বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রৌ’ প্রহসনের বৃত্তগঠনরীতির সাদৃশ্য অনুভব করা যায়। এখানে একদিকে জমিদার ভক্তপ্রসাদ, আর অন্যদিকে হানিফ-ফতেমা-বাচস্পতির সম্মিলিত প্রতিরোধে এসেছে প্রহসনের রসনিবিড়তা। “ও পুঁটি, এটি তো বুড়ো লাজুক দেখছি রে। আমার দিকে একবার চাইতেও কি নাই (ফতে) সুন্দরী, একবার বদন তুলে দুটো কথা কও আমার জীবন সার্থক হোক”—বৃদ্ধ ভক্তপ্রসাদের এই জান্তব কামনা চরিতার্থ করবার প্রচেষ্টা শেষে ব্যর্থ হয়েছে তার স্বীকারোক্তি : “আমি যেমন অশেষ দোষে দোষী ছিলাম, তেমনি তার সমুচিত প্রতিফলও পেয়েছি। এখন নারায়ণের কাছে এই প্রার্থনা করি যে এমন দুর্সম্মতি যেন কখনো না ঘটে।” ভক্তপ্রসাদ নিঃসন্দেহে এক অনন্য ব্যঙ্গচিত্র, কিন্তু হানিফ ও ফতেমা বাংলা সাহিত্যে দ্বিতীয়রহিত। যশোহর জেলার চাষীর মুখের ভাষা এবং তাদের চরিত্রাঙ্কনে মধুসূদনের কৃতিত্ব সহজেই চোখে পড়ে। এদের গ্রাম্য সরলতা, মুখের ও প্রাণের কথা এবং সমস্যাক্লিষ্ট রূপ বিস্ময়কর নৈপুণ্যে উপস্থাপিত হয়েছে। “হা আল্লা, এ কাফের শালা কি মুসলমানের ইজ্জত মাতি চায়। দেখিস্ ফতি, যা করে দিচ্ছি, যেন ইয়াদ থাকে, আর তুই সমঝে চলিস” আঞ্চলিক ভাষায় এই ধরনের জীবন্ত সংলাপ রচনার প্রথম কৃতিত্ব সম্ভবত মধুসূদনেরই প্রাপ্য, যার সার্থক উত্তরসূরী তোরাপ চরিত্রের স্রষ্টা দীনবন্ধু মিত্র।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টির তির্যকশীলতা উদ্ভব পরিস্থিতি রূপায়ণ ক্ষমতা জীবনের ভ্রান্তিসন্ধানের অসামান্য নিপুণতা, কৌতুকদীপ্ত বাক্যযोजना এবং চরিত্র চিত্রণের অনন্য দক্ষতা ইত্যাদি গুণের জন্য তার প্রহসন দুটি বাংলা সাহিত্যের কালোত্তীর্ণ সম্পদ হয়ে উঠেছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় বেলগাছিয়া নাট্যশালার কর্তৃপক্ষ যাদের অনুরোধে কবি এই নাটক লিখেছিলেন, কিন্তু তাঁরা শেষ পর্যন্ত প্রহসন দুটি মঞ্চস্থ করেন নি। তাই অভিমানী কবি আক্ষেপ করে বলেছেন : “Mind, you all broke my wings once about the face ; if you play a similar trick this time I shall forswear Bengali and write books in Hebrew and Chinese.” বিতুষ্ট মধুসূদন আর প্রহসন লেখেন নি।

বাংলা নাট্যসাহিত্যে মধুসূদনই প্রথম নাট্যকার, যিনি প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন দর্শকের প্রয়োজনে ‘dramatic relief’। মহাকবির জীবন-নাট্যে অকালে যবনিকাপাত না ঘটলে হয়ত আরো বিস্ময় আমাদের জন্য অপেক্ষা করে থাকত। কিন্তু তিনি ‘ক্ষণিকের অতিথি’ হয়ে রইলেন, যদিও এই ক্ষণকালের আবির্ভাব তাঁকে দান করেছিল গ্লানিহীন অমরতা।